বাংলাদেশের উৎসব

মুনতাসীর মামুন

বাংলা একাডেমী ঢাকা

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪০০
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

বাএ ২৯৫০

পাণ্ডুলিপি
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা-১০০০

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

Bangladesher Utsava (Festivals of Bangladesh) by Muntasir Mamun, Published by Shamsuzzaman Khan, Director, Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition: February, 1994. Price : Taka 70.00 Us. Dollar 3 only.

ISBN 984-07-2959-4

জনাব শামসুজ্জামান খান
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

গত কয়েক বছর ধরে আমি চেষ্টা করেছি তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের (মূলত উনিশ শতকের) সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি রূপরেখা তৈরি করতে। এতোদিন বাংলার যে সব ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাতে এ ভূখন্ডটি অনালোচিত রয়ে গেছে। তাই আমার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—এক, পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও দুই, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ। ইতোমধ্যে এই ফ্রেমের আওতায় উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ, সংবাদ সাময়িক পত্র, সভাসমিতি, থিয়েটার নিয়ে কাজ করেছি এবং সে সব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের উৎসব এ ধারার আরেকটি সংযোজন।

বর্তমান গ্রন্থে প্রধানত ধর্মীয় উৎসব নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হ'ল ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল আজহা, মুহররম, জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজা। বাংলাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় মুসলমান ও হিন্দুরাই পালন করেন এসব উৎসব। এছাড়াও আলোচনা করা হয়েছে নববর্ষ সম্পর্কে। বাংলাদেশে এটি এক অর্থে একমাত্র সেক্যুলার উৎসব, যা পহেলা বৈশাখে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই পালন করেন। বাংলাদেশের আরো দু'টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খৃষ্টান ও বৌদ্ধদেরও উৎসব আছে। কিন্তু সেগুলি কখনও মূল ধারায় ছিল না, এখন তো নয়ই। সে জন্য এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিনি।

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধ দেবের জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ, পরিনির্বাণ সবই বৈশাখী পূর্ণিমায়, তাই এ উৎসব বৌদ্ধদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র উৎসব। এনামুল হক লিখেছেন- "আমাদের বাংলাদেশে সহস্রাধিক বছর আগেও বৈশাখী পূর্ণিমা মহাসমারোহে পালিত হতো বলে অনুমান করার পক্ষে সঙ্গত কারণ রয়েছে। ধর্মের 'গার্জন' পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হতো। মালদহ ও রাজশাহীর গম্ভীরার সাথে ধর্মের গার্জন-এর যোগ কতটুকু আছে, বা নেই, তা এই সূত্রে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখার একটি চমৎকার বিষয়। বলাবাহুল্য, ধর্মদেবতা

যে বৌদ্ধ দেবতা তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন।"[১]

ঔপনিবেশিক শাসনামলে, খৃষ্টানদের ক্রীসমাস বা যীশুখৃষ্টের জন্মদিন খুব জাঁকালোভাবে উদযাপিত হ'ত বিশেষ করে কলকাতায়। কারণ, শাসকরা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী; অনেক সময় তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্যও দেশীয়রা নানা রকম অনুষ্ঠান করতেন। দেশীয়রা বেশ লম্বা ছুটি ভোগ করতে পারতেন বলে তাদেরও আপত্তি ছিল না।[২] এখন বাংলাদেশে বৌদ্ধ বা খৃষ্টানদের সংখ্যা নগণ্য। তাদের উৎসবও পালিত হয়, তবে তা স্বাভাবিক কারণেই আগের মতো চোখে পড়ে না।

উৎসবের ভিত্তি যৌথ রিচ্যুয়াল। প্রাচীন আমলে, ম্যাজিকের ওপর বিশ্বাস অভিঘাত হেনেছে পরিবার বা গোষ্ঠীর ওপর এবং সে কারণে, অধিকাংশ প্রাচীন রিচ্যুয়ালই যৌথ কর্ম। মানুষের প্রধান কর্ম কৃষির সঙ্গেও যোগ ছিল অনেক রিচ্যুয়াল, উৎসবের। শুধু তাই নয়, এসব রিচ্যুয়াল নিয়ন্ত্রিত হ'ত চান্দ্রমাসের দ্বারা। প্রাচীন যৌথ রিচ্যুয়াল ছিল অতি প্রাকৃতিককে বশে আনার ম্যাজিকাল প্রক্রিয়া। পরবর্তী পর্যায়ের সংস্কৃতিতে সেই প্রক্রিয়ার চারিত্রিক উপাদান রয়ে গেছে। বিশেষ করে ধর্মীয় উৎসবে যা যুক্ত ছিল কৃষির সঙ্গে। পরে অবশ্য এসব উৎসব হয়ে ওঠে অনেক ফর্মাল এবং বাদ পড়ে যায় স্বতস্ফূর্ততা।[৩]

১. এনামুল হক, 'বৈশাখী পূর্ণিমা বা বৌদ্ধ পূর্ণিমা', মনীষা মঞ্জুষা, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৯৬

২. এ শতকের প্রথম দিকে ক্রীসমাস পালিত হতো কি ভাবে বিশেষ করে কলকাতায় তার বিবরণ দিয়েছেন জনৈক ইংরেজ-

"The christmas party is a great occassion, but it cannot be the family reunion in India that is here, it is rather the grouping of a circle of companies in exile, who try, for a few brief hours, to keep up the old fashions, and to make believe that they are quite at home. The native largely accept and enjoys the holiday, with the very dimmest notion of what it may mean, and he judiciously takes the opportunity of sending propitiatory presents to his European superior. These are but of a trifling character, and take the form of articles calculated to appeal to the organs of digestion. These tokens of goodwill are generally accepted, and then, with more prudence than courage, quietly passed on to somebody who is better pleased with them than in the original recipient. He dreads experiments himself, but does not abject to letting others try them."

William H. Hart, *Everyday Life in Bengal*, London, 1907, pp 108-109.

৩ Rabert Briffault, 'Festivals', Encyclopaedia *of the Social Science*, vol 6, New York, p1931, pp 198-201.

বর্তমান গ্রন্থে যে সব উৎসব আলোচিত হয়েছে মূলত তা যুক্ত ধর্মের সঙ্গে। কিন্তু একেবারে মূলে পৌঁছলে দেখা যাবে, ধর্মীয় কারণেই শুধু এগুলি বিকশিত হয় নি। একসময় এগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বতস্ফূর্ততা। অপেক্ষাকৃত ফর্মাল উৎসব মুসলমানদের ঈদেও কয়েক বছর আগে গান-বাজনা ছিল একটি উপাদান যা স্বতস্ফূর্ততার প্রতীক। মেলার কথাও আসে এ প্রসঙ্গে। শুদ্ধিকরণ, ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এ দু'টি উপাদান রয়ে গেছে এখনও। ঢোল-ডগরের বদলে কাওয়ালী এসেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যেতে পারে, এখন এসব উৎসব অনেক ফর্মাল হলেও অনেক সময় তা আর ধর্মীয় মাত্রায় আবদ্ধ থাকে না। হয়ে ওঠে, সামাজিক যৌথ কর্মকাণ্ড, যোগাযোগের প্রক্রিয়া প্রভৃতি।[৪] এ সামাজিক মাত্রার জন্যও, আলোচিত উৎসবগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, আলোচিত উৎসবগুলির উৎস প্রাচীন। প্রাচীন আমলের লোকবিশ্বাস এর ভিত্তি, পরে ধর্ম যাকে ফর্মাল করেছে। বিশেষ করে ঈদ বা মুহররম যা আগে উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে রমজানের কথাও যা প্রচলিত প্যাগান আরবেও।[৫] কালে কালে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি প্রভাব ফেলেছে

৪. অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, 'বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে উৎসবের চরিত্র বহুলাংশে বদলে গেছে। এর মূলে রয়েছে পীরবাদ। পীরবাদ কোনক্রমেই সমর্থনীয় নয়। কিন্তু ফরিদপুরের আটরশিতে ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার থেকে, সাধারণত ৫,৬ এবং ৭ই ফাল্গুন জিকিরের আয়োজন করা হয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। কয়েক হাজার গরু ছাগল জবাই করে কয়েক দিন যাবৎ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। যদিও এর মধ্যে ধর্মীয় অঙ্গত্ব আছে, ধর্ম-ব্যবসায়ের জঘন্য রূপ আছে, তথাপি কয়েক লক্ষ লোকের আগমনে ও আহারের ব্যাপক আয়োজনে এই অনুষ্ঠান কয়েকদিন যাবৎ উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে। এগুলিকে নব উৎসব বলা যায়। ... এদেশে ওরস ব্যক্তিগতভাবে পীরদের ধর্মীয় সম্মেলনের রূপ নিয়েছে যেখানে জিকিরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আহারের ব্যবস্থা থাকে। ফলে জনসমাগমের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা যায় না এবং এই জনসমাগম অনেকটা উৎসবের চরিত্র বয়ে আনে।'

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ,

Mazharul Islam, 'Pilgrimage in Bangladesh', Folklore and Social Change, Calcutta, 1985.

৫. "The same Judaco-christian influences, which had even before Muhammad induced individual god-seekers to lead an ascetic mode of life, are likely to have suggested to the muslim comunity the early adoption of fasting as a means of spiritual discipline...

The Ramdan Fast has been likened to the christian Quadragesima and also to Manichaean practices, but it should be remembered that the 'holy' month was familiar concept in pagan Arabia, although no rite is known to have continued

এবং বদল হয়েছে ধর্মের শুদ্ধ রূপও। যে কারণে, বাংলাদেশের মুসলমান ও মধ্যপ্রাচ্যের বা ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানের জীবনচর্যায় ধর্মীয় দিকটি এক নয়।

ইসলাম বাংলাদেশে এসেছে, ব্যাপকতা পেয়েছে কিন্তু কালক্রমে এতোসব লৌকিক উপাদান এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যে, র‍্যাডিকাল শুদ্ধিকরণ অভিযানও বাংলাদেশের মুসলমানের জীবনচর্যা থেকে তা বাদ দিতে পারবে না। যেমন, ঈদে সেই গান-বাজনার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মাইজভান্ডারী গ্রুপের মধ্যে এখনও গান বাজনার উপাদানটি প্রধান। অনেক 'শুদ্ধ' মুসলমান মাইজভান্ডারী পীরের ভক্ত। ঈদে রঙীন নিশান দিয়ে সাজানোর প্রথা, মেলা এখনও রয়ে গেছে। সে জন্য ধর্মীয় হয়েও, বাংলাদেশের হিন্দু -মুসলমানের উৎসব নিছক ধর্মীয় মনোটনে পরিণত হয় নি। উৎসবের বিস্তারিত বিবরণগুলি দেখলে তা স্পষ্ট হবে।

উৎসব সামাজিক আধিপত্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু সম্পদের অতি অসম বন্টনের কারণে, শ্রেণীর কারণে তা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন ঈদ বা দুর্গাপূজার আনন্দ অল্প কিছু লোকের জন্য। ঈদের সময় অধিকাংশই জামাতে যায়, কিন্তু ঈদ আর তাদের জন্য নেই। বিশেষ করে কোরবানীর ঈদ যার কথা উল্লেখ করেছি। জন্মাষ্টমীও এক সময় তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দুর্গাপূজাও। এখন হিন্দু সম্প্রদায়ের হীনবলতার কারণে তা হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে। আর জন্মাষ্টমী তো লুপ্তপ্রায়।

মারডক উনিশ শতকের ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনুযোগ করে বলেছিলেন, ভারতের সর্বত্র মানুষ ধর্ম বা পাপ সম্পর্কে তেমন সজাগ নয়। তারা শুধু উৎসাহী তাদের উৎসবে।[৬] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা ছিল আরো সত্য। কথাটা বরং এভাবে বলা যায়, বাঙালী ধার্মিক ছিল বটে, তবে খুব কম সময়েই ধর্মের কারণে তারা উন্মত্ততা দেখিয়েছে। তাদের ধর্মে এবং উৎসবে এত লোকায়ত উপাদানের

through the whole of any pre-Islamic holy months. Ramdan was selected because it was in this month, the fifth of Muslim year, that the Koran was sent down as guidance for the people...G. E. Van Grunebaum, *Muhammadan Festivals*, London, 1957, pp51-52.

৬. "One great difficulty everywhere in India is to secure attention to the gospel Message. The people have no deep sense of sin, and do not feel the need of the physician of souls. On the contrary, they are warmly interested in their festivals, among the woman especially they are for the time their absorbing thought."

John Murdoch, *Hindu and Muhammadan Festivals*, London. 1904

অনুপ্রবেশ ঘটেছে যে, যার ফলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা জেগেছে, একে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। আলোচিত উৎসবগুলির এই হচ্ছে ইতিবাচক দিক।

উৎসবগুলির কোনো কোনো ব্যাখ্যা বা বিবরণে হয়ত কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন, কিন্তু কাউকে আঘাত দেবার জন্য এ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নি। একেকটি পর্যায়ে একেকটি উৎসবের রূপ যা ছিল, তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। কারণ, এই উদ্ধৃতিগুলি হয়ত পরবর্তী গবেষকদের কাজে লাগতে পারে। মূল কথা যা বলতে চেয়েছি, তাহ'ল এখন উৎসবসমূহ যে ফর্মে আছে, সে ভাবেই তা মেনে নেয়া ভালো, শুদ্ধিকরণের নামে ধর্মে বা উৎসবে র‍্যাডিকাল কিছু করার চেষ্টা করলে সমাজে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কারণ, বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক গড়ন অন্য রকম।

ঈদ, জন্মাষ্টমী ও মুহররম শুধু ঢাকায় কি ভাবে পালিত হ'ত তার বিবরণ আগে সংকলিত হয়েছে আমার 'ঢাকার উৎসব ও ঘরবাড়ি' গ্রন্থে। পরবর্তীকালে তা সংশোধন, পরিবর্তন করে বাংলাদেশের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এবং এ বিষয় তিনটি লেখাই প্রকাশিত হয়েছে মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'সুন্দরম'-এ। দুর্গাপূজার ওপর লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠে।

প্রবন্ধগুলি তৈরি করার সময় আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক মোমেন চৌধুরী ও অধ্যাপক যতীন সরকার। জন্মাষ্টমীর সঙের গানগুলির ব্যাপারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কূটনীতিবিদ জনাব মাহবুবুল আলম। বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের আগ্রহে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৩

মুনতাসীর মামুন

ঈদ

এক

মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি—উৎসব হচ্ছে ঈদ-উল-ফিত্‌র ও ঈদ-উল আজ্‌হা। আমাদের দেশে এ দুটি ধর্মীয় উৎসব পালিত হয় যথেষ্টই ধুমধামের সঙ্গে। ঈদ-উল-ফিত্‌র আবার যুক্ত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র মাস রমজানের সঙ্গে আর ঈদ-উল আজ্‌হা যুক্ত পবিত্র হজ্জব্রতের সঙ্গে। বাংলাদেশে [বর্তমান ভৌগোলিক সীমানা] এখন যেভাবে ঈদ পালিত হচ্ছে, একশো বা দেড়শো বছর আগেও কি সাধারণ মানুষ সেভাবে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতেন ঈদের দিকে? বা কি ভাবে পালিত হ'ত ঈদ? এ দুই উৎসবের ওপর কি প্রভাব ফেলেছিল কৃষিজীবী মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস? এই সব জিজ্ঞাসা তথ্যনির্ভর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, বিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা মেলে না। জ্ঞানের উৎস জিজ্ঞাসা। আর রসুল (দঃ) নিজেও বলেছেন জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীনেও যেতে। সুতরাং বর্তমান আলোচনা সে পরিপ্রেক্ষিতেই, কারো ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়।

সম্প্রতি 'ইসলামী পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব' নামক এক প্রবন্ধে বাহারউদ্দিন সামগ্রিকভাবে ঈদ-উল-ফিত্‌র ও ঈদ-উল আজ্‌হা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন তিনি রমজান, হজ সম্পর্কেও, মূলত প্রাচীন লোকবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে।[১]

প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, 'ঈদ, সওম এবং রমজানের মূল অর্থ এবং তাদের উৎসভূমির ভিত্তিতেই অনুমান হয় রোজার উপবাস জন্ম নিয়েছে কৃষিনির্ভর সমাজে হয়ত বা প্রাচীন সিরিয়ায়।'

রমজান মাস মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র মাস এবং কোরানে একমাত্র এ মাসের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাসেই নাজেল হয়েছিল কোরান, প্রথম অহী পেয়েছিলেন মুহম্মদ (দঃ), গিয়েছিলেন তিনি মেরাজে। বাহারউদ্দিনের মতে, মক্কা

থেকে মদিনায় যাওয়ার আগে রমজানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না মুসলমানদের। এর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হিজরতের পরেই। এ অনুমানের ভিত্তি "রমজান শব্দটি আরবি 'রমজ' ধাতু থেকে আগত। 'রমজ' মানে দাহ, তাপ, পোড়ানো। আরবি শব্দ-তাত্ত্বিকদের ধারণা, চান্দ্র মাস চালু হওয়ার [চান্দ্র বর্ষই নিয়ন্ত্রিত করে মুসলমানদের উৎসব] অনেক আগে, প্রাচীনকালে গরমের মওসুমে এই মাস পড়ত বলে এর নাম হয় রমজান। রমজানের সঙ্গে উপবাসের আরবি প্রতিশব্দের ধ্বনিগত কোনো মিল নেই। উপবাসের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে সওম। এর অর্থের সঙ্গেও উপবাস ব্রতের কোন মিল নেই। এর অর্থ হ'ল আরাম বা বিশ্রামে থাকা। ... এবং হিজরতের পরেই সম্ভবত ইহুদি সিরিয়াক সূত্র থেকে উপবাসের প্রতিশব্দ হিসেবে সওম শব্দটি গ্রহণ করেন মুহম্মদ। কোরানের ১৯ নং সুরা মরিয়মের ২৭ নং আয়াতে সওম শব্দটির উল্লেখ আছে।"[২]

দ্বিতীয় হিজরিতে নির্দেশ এসেছিল অবশ্য-কর্তব্য হিসেবে রমজান পালনের এবং এ উপবাসের সঙ্গে মিল আছে আবার পূর্বাঞ্চলীয় খৃস্টানদের, যারা নির্দিষ্ট সময়ে চল্লিশ দিন পালন করেন উপবাস। রমজান শেষে ঈদ-উল-ফিতর। ঈদের অর্থ উৎসব। তবে, "আভিধানিক অর্থ পুনরাগমন বা বারবার ফিরে আসা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান জ্ঞাপক অধিকাংশ শব্দের মত ঈদ শব্দটি মূলত সিরিয়াক।" আরো লিখেছেন বাহারউদ্দিন "ঈদ শব্দটির অর্থের সঙ্গে আজকের অর্থের কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু সামাজিক উৎসবের প্রকৃতিকে অর্থবহ করে তোলে তার আদি অর্থ। সামাজিক উৎসব বারবার ফিরে আসে, আর ঈদ শব্দের আদি অর্থেও আছে তার ইঙ্গিত। ঈদ শব্দটির আদি অর্থ ও তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম খতিয়ে দেখে মনে হয়, হয়ত এককালে এই ধরনের এক সামাজিক উৎসবের সঙ্গে পরিচিত ছিল সিরিয়ার জনগোষ্ঠী। হয়ত তার কৃষিজ আচারেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এই উৎসব এবং তাদের কাছ থেকেই আচার-অনুষ্ঠান জ্ঞাপক শব্দের মতই আরবরা আমদানি করেছেন এই উৎসব ও তার প্রকৃতিকে।"[৩]

একই কথা প্রযোজ্য ঈদ-উল আজ্‌হা ও হজ সম্পর্কে যার সঙ্গে যোগ আছে "আরব কিংবা অন্য কোন সেমেটিক জনগোষ্ঠীর নবান্ন" উৎসবের।

বাংলাদেশে যে ভাবে এ উৎসব দু'টি পালিত হ'ত, তাতে আমরা দেখব সেখানে প্রভাব ফেলেছিল কৃষিজীবী মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস। এবং সে লোকায়ত বিশ্বাস বিশ্লেষণ করলে সহজেই নস্যাৎ হয় সে মিথ্যের যে, এদেশে মুসলমানরা বহিরাগত। কারণ, যে ভাবে পালিত হ'ত উৎসব দু'টি তাতে লোকায়ত বিশ্বাস বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির প্রভাবই ছিল বেশি।

দুই

উৎসব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ ঈদের দিনটি কিভাবে পালন করতেন সে সম্পর্কে অবশ্য খুব বেশি কিছু জানা যায় না। এ ধরনের উৎসব সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আত্মজীবনী, সাহিত্য বা সমসাময়িক সংবাদ-সাময়িক পত্রে। সাহিত্য, সংবাদ-সাময়িক পত্রে ঈদের তেমন কোনো বিবরণ পাই না। আর হিন্দু বা মুসলমান যিনিই আত্মজীবনী লিখে গেছেন তিনিই দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, মুহররম, এমন কি রথযাত্রা বা বিভিন্ন পূজা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন; কেউ কি উল্লেখ শুধু ঈদ সম্পর্কে। অবশ্য এ শতাব্দীর প্রথম দু'তিন দশকে যাঁরা জন্মেছিলেন, তাঁদের আত্মজীবনীতে ঈদ-উল আজ্‌হা বা কোরবানী বা রজমান সম্পর্কে খানিকটা তথ্য আছে।

এ থেকে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ঈদ-উল-ফিতর বাংলাদেশে তেমন বড় কোন উৎসব হিসেবে পালিত হয়নি, তাহলে কি ভুল হবে? মনে হয় না। আজ আমরা যে ঈদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করি বা যে ঈদকে দেখি আমাদের একটি বড় উৎসব হিসেবে তা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য মাত্র। এর কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। ঔপনিবেশিক আমলে যে উৎসব সবচেয়ে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হ'ত এবং যে ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সবচেয়ে বেশি ছুটি বরাদ্দ ছিল তা ক্রিসমাস। হ'ল এর কারণ স্বাভাবিক। ইংরেজরা ছিল শাসক। সুতরাং তাদের উৎসব যে শুধু জাঁকালো হ'ত তা নয়, এ নিয়ে মাতামাতিও কম হ'ত না। স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও যোগ দিতেন ক্রিসমাসে। তৎকালীন বাংলায় কলকাতা ছিল ক্রিসমাস উৎসব পালনের প্রধান কেন্দ্র। কারণ কলকাতা ছিল রাজধানী এবং শাসকগোষ্ঠী ও শহুরে সম্পন্ন ভদ্রলোকদের বেশির ভাগ সেখানেই থাকতেন। তবে গ্রামাঞ্চলের কথা দূরে থাক শহর বা মফস্বলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

ঐ সময় বিত্ত, বিদ্যার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের থেকে হিন্দুরা সম্প্রদায় হিসেবে এগিয়ে ছিলেন অনেক। ফলে ক্রিসমাসের পর সরকারিভাবে তো বটেই, সম্প্রদায়গত আধিপত্য এবং ঐতিহ্যের কারণে এ অঞ্চলে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে জাঁকালো এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। সরকারি ছুটির পরিমাণ ঈদের থেকেও পূজার জন্য ছিল বেশি। পূজার ছুটিতে সম্পন্ন ভদ্রলোকরা বেরিয়ে পড়তেন ভ্রমণে। আসতেন জমিদাররা শহর থেকে প্রজাদের খোঁজ খবর নিতে। বিত্ত ছিল তাঁদের, সুতরাং ধুমধামের সঙ্গে উৎসব পালনে বাধা ছিল না। পূজা চলত কয়েক দিন এবং সে উপলক্ষে হ'ত যাত্রা, কবিগান, নাচ। গ্রামের সাধারণ মানুষের

তো বিনোদন বলতে কিছু ছিল না [এখনও নেই], তাই ছেলে বুড়ো সবাই সাগ্রহে যোগ দিতেন উৎসবে। এসব কিছুর একটা ঝলমলে রঙীন দিক ছিল। তাই পূজার বর্ণনা আমরা প্রায় সব আত্মজীবনীতেই পাই। অন্যান্য নথিপত্রেও পূজা সম্পর্কে আছে পর্যাপ্ত তথ্য।

পাকিস্তান হওয়ার আগে বাংলাদেশের মুসলমানরা আধিপত্য বিস্তারকারী সম্প্রদায় ছিল না। একশো বা দেড়শো বছর আগে সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের অবস্থা অনুমেয়। শাসক ইংরেজরা স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব দেয়নি মুসলমানদের ঈদকে। এর জন্য সরকারি ছুটি বরাদ্দ ছিল কম। ঐ সময় অনেক মুসলমান চাকুরেদের আবেদনপত্রে দেখা যায়, তাঁরা আবেদন জানাচ্ছেন ছুটি বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু কর্ণপাত করা হয়নি তাতে। আর ছুটি বৃদ্ধি করলেই বা কি হ'ত? বড় জোর গ্রামের বাড়িতে ফিরে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে যেতে পারতেন। ঈদকে উৎসবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে। কারণ, গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মুসলমান ছিল বিত্তহীন।

মুহররমের বর্ণনা পাওয়া যায় অনেক জায়গায়, সংবাদপত্রেও। এটি পালিত হ'ত বেশ জাঁকজমক করে, বিশেষ ভাবে ঢাকায়। কারণ, নবাবী আমল থেকেই পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এর পেছনে। তা' ছাড়া মুহররম চলতও সপ্তাহখানেক ধরে, জাঁকজমকের ব্যাপারটাও জড়িত ছিল এর সঙ্গে। ঈদ মুসলমানদের প্রধান উৎসব হিসেবে পালিত না হওয়ার আরেকটি কারণ, বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা। ফারায়েযী আন্দোলনের আগে গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের কোনো ধারণা ছিল না বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে। ইসলাম ধর্মে লোকজ উপাদানের আধিপত্য ছিল বেশি [প্রায় ক্ষেত্রে হিন্দু রীতিনীতির]। ১৮৮৫-এর দিকে জেমস ওয়াইজ লিখেছিলেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সরল, অজ্ঞ কৃষক। তারা এখন ইসলাম ধর্মে যে সব বিজাতীয় রীতিনীতি প্রবেশ করেছিল, তা উৎপাটন করতে চাইছে। কিন্তু, এরপর ওয়াইজ যে উদাহরণ দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে, কৃষকরা এর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। লক্ষ্যা নদীর তীরে, কোরবানী ঈদের সময় গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়েছে নামাজ পড়বেন বলে। কিন্তু জমায়েতের একজনও জানতেন না কি ভাবে ঈদের নামাজ পড়াতে হয়। তখন নৌকোয় ঢাকার এক যুবক যাচ্ছিলেন। তাঁকে ধরে এনে পড়ানো হয়েছিল নামাজ।[৪]

আমার এক সহকর্মীর পিতা যিনি ছিলেন একজন পীর, তাঁকে বলেছিলেন, মুসলমান ছিলেন বটে [তাঁর জন্ম ১৮৮৯ সালে] কিন্তু ছেলেবেলায় রোজা বা ঈদ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। মসজিদ ছিল হয়ত কয়েক গ্রাম মিলে

একটি। গত শতকে এবং এ শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন বাংলার এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন- "তখন ফরায়েজী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই। মুসলমানেরা নামাজ পড়িত না। গ্রামে কোনো মসজিদও ছিল না। স্থানে স্থানে দরগা ছিল। মুসলমানেরা তপন [তহবন্দ] বা লুঙ্গি পরিত না। কাছাকোঁচা দিয়া ধুতি পরিত। তাহাদের অনেকেরই হিন্দু নাম ছিল, যেমন গোপাল, সনাতন, ঈশান ইত্যাদি। মুসলমানেরা দুর্গা কালী প্রভৃতির পূজার ভোগের জন্য মানকচু, কুমড়া ও বলির জন্য পাঁঠা দিত। তাহাদের দরগায় গরু প্রভৃতি জন্তুর মূর্তি রাখা হইত। মাদার বাঁশের অর্চনা হইত [এ কথা উল্লেখ করেছেন আবুল মনসুর আহমদও]। বাঁশের উপরে লম্বা চুল বাঁধিয়া হিন্দু-মুসলমান সকলের বাড়িতেই যাইত এবং চাউল পয়সা সংগ্রহ করিত। দরগাতে সিন্নি দেওয়া হইত। ... [অষ্ট নাগের পূজার জন্য] মুসলমানেরাই বলির জন্য হাঁস দিত। মুসলমানেরা সেকালে কালী পূজার সময়েও বলির জন্য পাঁঠা দিত; দুর্গাপূজার সময়ে ডিম দিত। [অন্য দিকে] কাগমারীর হিন্দু জমিদারেরা বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে বাদ্যভাণ্ডসহ দরগার নিকটে যাইতেন এবং নানা উপচারে দরগার অর্চনা করিয়া বাটীতে ফিরিতেন। দরগার নিকটে বাদ্যভাণ্ড করিলে মুসলমানদের খুব আনন্দ হইত।"[৫] আবুল মনসুর আহমদের আত্মজীবনীতেও মোটামুটি একই চিত্র পাই। জানিয়েছেন তিনি, সে সময় [উনিশ শতকের শেষার্ধেও] নামাজ-রোজা চালু ছিল না। তাঁদের অঞ্চলে ছিল না কোনো মসজিদ, গ্রামাঞ্চলে কিভাবে রোজা পালিত হ'ত তার বিবরণও দিয়েছেন তিনি। "তরুণদের ত কথাই নাই, বয়স্কদেরও সকলে রোজা রাখিত না। তারাও দিনের বেলা পানি ও তামাক খাইত। শুধু ভাত খাওয়া হইতে বিরত থাকিত। পানি ও তামাক খাওয়াতে রোজা নষ্ট হইত না এই বিশ্বাস তাদের ছিল। কারণ পানি তামাক খাইবার সময় তারা রোজাটা একটা চোঙ্গার মধ্যে ভরিয়া রাখিত। কায়দাটা ছিল এইঃ একদিকে গিরাওয়ালা মোটা বরাক বাঁশের দুই একটা চোঙ্গা গৃহস্থের বাড়িতে আজও আছে; আগেও থাকিত, তাতে সারা বছর পুরুষরা তামাক রাখে। মেয়েরা রাখে লবণ, সজ, গরম মসলা, লাউ কুমড়ার বিচি ইত্যাদি, রোজার মাসে মাঠে যাইবার সময় এই রকম এক একটা চোঙ্গা রোজাদাররা সঙ্গে রাখিত। পানি তামাকের শখ হইলে এই চোঙ্গার খোলা মুখে মুখ লাগাইয়া খুব জোরে দম ছাড়া হইত। মুখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি গামছা নেকড়া বা পাটের টিপলা দিয়া চোঙ্গার মুখ কষিয়া বন্ধ করা হইত যাতে বাতাস বাহির হইয়া না আসে। তারপর আবশ্যক মত পানি তামাক খাইয়া চোঙ্গাটা আবার মুখের কাছে ধরা

হইত। খুব ক্ষিপ্র হস্তে চোঙ্গা টিপলটা খুলিয়া মুখ লাগাইয়া মুখ চুষিয়া চোঙ্গার বন্ধ রেজা মুখে আনা হইত এবং ঢোক গিলিয়া একেবারে পেটের মধ্যে ফেলিয়া দেয়া হইত। খুব ধার্মিক ভাল মানুষ দু'একজন এমন করাটা পছন্দ করিতেন না বটে, কিন্তু সাধারণভাবে এটাই চালু ছিল।"[৬]

তবে, এর চারদশকের মধ্যে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল। রাজনৈতিক ভাবে মুসলমানরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই রাজনীতিতে ধর্ম ছিল একটি প্রধান উপাদান। একটি আত্মজীবনীতে তার ইঙ্গিত পাই। খন্দকার আবু তালিব লিখেছেন-

"রমজানের ও ঈদের চাঁদ দেখার জন্য ছেলে বুড়োদের মধ্যে তখনকার দিনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখেছি, তা এখনো ভুলতে পারিনি। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়টা ছিল বৃটিশের আমল। রোজার চাঁদ ও ঈদের চাঁদের খবরাখবর তখন কলিকাতা হতে প্রচার করা হতো। আর এ কারণেই রোজা রাখা ও ঈদের উৎসব ভারতের সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে একদিনে উদযাপিত হতো। ফলে কোনো বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো না। জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষই এই পবিত্র মাসটির সম্মানার্থে ধৈর্য, সহ্য, সংযমের পরিচয় দিত। দিনের বেলা কোনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে দেখিনি যারা রোজা রেখেছে এমন ব্যক্তির সামনে বিড়ি টানতে ও চা পান করতে।"[৬ক]

মুকুন্দরামের 'চন্ডীকাব্য'-এও মুসলমানদের ধর্মপ্রাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রাণ গেলেও 'রোজা নাহি' ছাড়ে–

"ফজর সময়ে উঠি, বিছানা লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ।
সোলেমানি মালা ধরে, জপে পীর পয়গম্বরে
পীরের মোকামে সেই সাঁজ
দশবিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরান।
বড়ই দানিসমন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।"[৭]

আবুল মনসুর আহমদ ও উপরোক্ত বর্ণনার তুলনামূলক বিচার করে বলা যেতে পারে, মুকুন্দরাম লিখেছিলেন বহিরাগত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে। আবুল মনসুর বর্ণনা করেছেন, গ্রাম বাংলার সাধারণ মুসলমানদের। অবশ্য উল্লেখ করেছি এ

শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশক থেকে পরিবর্তিত হয় অবস্থা যার ইঙ্গিত মেলে আবু তালিবের লেখায়। মির্জা নাথানও বহিরাগত মুসলমানরা রমজান এবং ঈদ কিভাবে পালন করতেন তার বর্ণনা রেখে গেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ১৬১০ সালে। নাথান ছিলেন তাঁর একজন সেনাপতি। বাংলাদেশে মুঘল অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন নাথান তাঁর গ্রন্থ 'বাহারিস্তান-ই-গায়বী'তে। রমজান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "রমজান মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন ছোটবড় সকলে মিলিত হ'ত বন্ধু-বান্ধবদের তাঁবুতে।"[৮] এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাধারণ এক রীতি।

ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে আগত মুঘলরা বাংলার সাধারণ মানুষের তুলনায় ইসলাম সম্পর্কে জানতেন বেশি। কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম পালনে তাঁরা বেশি উৎসাহী ছিলেন না। ধর্মে আছে ঈদ মানে খুশী। সুতরাং রমজান থেকেই মোটামুটি তাঁরা সচেষ্ট থাকতেন যতোটা পারা যায় আনন্দ নিংড়ে নেওয়ার। সুরা পানেও তাঁদের অনাগ্রহ ছিল না।

বাংলাদেশে মুঘলদের আগমন বা তার আগে ঈদের বর্ণনা তেমন একটা পাওয়া যায় না। তবে, অভিজাতদের ঈদ পালন সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়।

'তাবাকাৎ-ই-নাসিরী'র লেখক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ জানিয়েছেন, সুলতানরা রমজান মাসে ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। প্রচারক নিযুক্ত করতেন এ জন্য। ঈদের নামাজ পড়ার জন্য নিয়োগ করতেন ইমাম। "শহরের বাইরের বিরাট উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ত এবং এসব স্থানকে ঈদগাহ্ বলা হ'ত।"[৯]

বাংলাদেশে ঈদের সবচেয়ে পুরনো বর্ণনা পাওয়া যায় মির্জা নাথানের লেখায়। ঈদ-উল-ফিত্‌রের সময় তিনি ছিলেন বোকাই নগরে। তিনি লিখেছেন–

"সন্ধ্যায় মোমবাতির আলোয় যখন নতুন চাঁদ দেখা গেল তখন শিবিরে বেজে উঠল শাহী তূর্য এবং একের পর এক গোলন্দাজ বাহিনী ছুঁড়তে থাকে গুলি যেন তা আতশবাজি। সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত চলে এ আতশবাজি। শেষ রাতের দিকে বড় কামান দাগান হয়। তাতে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের অবস্থা।"[১০]

অধ্যাপক আবদুর রহিম 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে' মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে ঈদের বিবরণ তৈরি করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনা সামগ্রিকভাবে যে চিত্র তুলে ধরে তা ভ্রান্ত। তিনি লিখেছেন, যেমন নাথানের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে-

"বাংলাদেশে মোগল সৈন্যদের ছাউনী থেকে ঈদের আনন্দবার্তা ঘোষণা করা হ'ত, এতে প্রকাশ পায়, কিভাবে মুসলমানরা ঈদ উৎসবকে স্বাগত জানাত এবং এই আনন্দ উৎসবে আমোদ প্রমোদ করত ও এর জন্য শোকরিয়া আদায় করত। ঈদের দিন মুসলমানরা নারী পুরুষ ও ছেলে মেয়েরা সুন্দর নতুন কাপড় পরত।"[১১]

সৈয়দ গোলাম হুসায়ন খান তাবতাবায়ীর "সিয়ারে মুতাখ্খিরীণ" (অষ্টাদশ শতক) থেকে আবদুর রহিম জানিয়েছেন যে, ঈদ-উল আজ্‌হা ছিল আনন্দ সফূর্তি ও সকল মানুষের জন্য নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরার একটি দিন। "নবাব আলিবর্দীখানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান তাঁর প্রিয়জনের মৃত্যুর দরুন এমন আনন্দের দিনেও শোকসন্তপ্ত ছিলেন। এ জন্য বৃদ্ধ নবাব শোকার্ত জামাতার গৃহে আসেন এবং তাঁকে নতুন পোশাক পরিচ্ছদ পরানোর জন্য বৃথা চেষ্টা করেন। পরে তিনি তাঁর বেগম ও হেরেমের মহিলাদেরকে এই পুণ্যদিনের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে নওয়াজিশের নিকট পাঠান যাতে তাঁরা তাঁকে উৎফুল্ল করে তুলতে পারেন।"[১২]

আজাদ হোসেন বিলগ্রামীর 'নওবাহার-ই-মুর্শীদকুলী খান' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ডঃ রহিম জানিয়েছেন, "মুসলমানরা সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা করে ঈদগায়ে যেত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা উৎসবের সময়ে মুক্তহস্তে অর্থ ও উপহারাদি পথে ছড়িয়ে দিতেন।"[১৩]

এসব বর্ণনা থেকে মনে হতে পারে, তিন-চারশো বছর আগে খুব ধুমধামের সঙ্গে ঈদ পালিত হ'ত। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে উনিশ শতকের অবস্থা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ বা কৃষ্ণকুমার মিত্র ঐ ধরনের বর্ণনা দেবেন কেন? নাথান যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বর্ণনাটি শুধু মুঘল সেনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গোলাম হোসেনের বর্ণনাটি নবাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। তৃতীয় বর্ণনাটির পরিপ্রেক্ষিত ঠিক নয়। মূল ব্যাপারটি ছিল এরকম- [যদুনাথ সরকারের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে] দ্বিতীয় মুর্শীদকুলি খাঁর সময় (১৭২৯) জয় করা হয়েছিল ত্রিপুরা। ২৯ রমজান নবাব এ খবর পেয়ে এত উল্লসিত হলেন যে, তিনি যেন দুটি ঈদ পালন করছেন। ঈদের দিন, এ কারণে, তিনি মীর সৈয়দ আলী ও মীর মোহাম্মদ জামানকে আদেশ দিলেন গরীবদের মধ্যে এক হাজার টাকা বিতরণ করতে। ঢাকা কিল্লা থেকে এক ক্রোশ দূরে ঈদগাহ্ যাবার পথে রাস্তায় ছড়ানো হয়েছিল মুদ্রা।[১৪]

তা'হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, ঈদের দিন যে হৈচৈটুকু হ'ত তা বহিরাগত উচ্চপদধারী বা ধনাঢ্য মুসলমানদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। এসবের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ছিল যোজনব্যাপী ব্যবধান। আর রইসরাও ঈদের দিন "পথে প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি ছড়িয়ে দিতেন" একথাও ঠিক নয়। [একবার দেওয়া হয়েছিল বিশেষ কারণে]। তবে, কিছু দান-খয়রাত হয়ত করতেন।

এরপর এ শতকের আগের ঈদের বর্ণনা তেমন আর পাই না। তবে, মুঘলরা যে ঈদের গুরুত্ব দিতেন, তা বোঝা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় [যেমন-ঢাকায়, সিলেটে] শাহী ঈদগাহ্‌র ধ্বংসাবশেষ দেখে। এরকম একটি ঈদগাহ্ আছে ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায়।

ধানমণ্ডির ঈদগাহ্‌টি মাটি থেকে চার ফুট উঁচু একটি সমতলভূমি। দৈর্ঘ্য এর ২৪৫ ফুট, প্রস্থ ১৩৭ ফুট।। বিস্তৃত তিন দিকে। পশ্চিমে ১৫ ফুট উঁচু প্রাচীর যেখানে রয়েছে মেহরাব ও মিম্বর। পাশ দিয়ে তখন এর বয়ে যেতো পান্থ নদীর একটি শাখা। এই শাখা নদী জাফরাবাদে সাতগম্বুজ মসজিদের কাছে মিলিত হ'ত বুড়ীগঙ্গার সঙ্গে। শাহসুজা যখন বাংলার সুবাদার তখন তাঁর প্রধান আমাত্য মীর আবুল কাসেম ১৬৪০ সালে নির্মাণ করেছিলেন ঈদগাহ্‌টি। সুবাদার, নাজিম ও অন্যান্য মুঘল কর্মকর্তারা নামাজ পড়তেন এখানে। ইংরেজ আমলে জরাজীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল ঈদগাহ্‌টি। তায়েশের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তবুও উনিশ শতকে [খুব সম্ভব শেষের দিকে] শহরের মুসলমানরা ঈদের নামাজ পড়তেন এই ঈদগাহে এবং এখানে আয়োজন করা হ'ত একটি মেলার।[১৫] অনুমান করে নিতে পারি, ঈদ উপলক্ষে এখানে হ'ত মেলা, সেখানে যোগ দিতেন শহর ও আশেপাশের এলাকার লোকজন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, মুঘল আমলে ঈদের দিন ঈদগাহে যেতেন মুঘলরাই, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্থান সেখানে ছিল না। তবে, তায়েশ-উল্লিখিত মেলার বর্ণনা থেকে অনুমান করে নিতে পারি, উনিশ শতকের শেষে এবং এ শতকের গোড়ায় ঈদের দিন আনুষঙ্গিক আনন্দ হিসেবে সাধারণ মানুষ যোগ করেছিলেন একটি লোকায়ত উপাদান-মেলা। তায়েশের বর্ণনা ছাড়া [তাও সম্পূর্ণ নয়] মেলার কথা আত্মজীবনীতে অবশ্য তেমন পাওয়া যায় না। তবে, বয়োবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি, ছেলেবেলায় ঈদ উপলক্ষে তাঁদের কোথাও কোথাও মেলা বসার কথা মনে পড়ে। সম্প্রতি আশরাফ-উজ-জামান তাঁর আত্মজীবনীমূলক এক নিবন্ধে এই মেলার কথা উল্লেখ করেছেন। "ঈদের মেলা হ'ত চক বাজারে এবং রমনা ময়দানে। বাঁশের তৈরি খাঞ্জা, ডালা আসত নানা রকমের। কাঠের খেলনা, ময়দা এবং ছানায়

খাবারের দোকান বসত সুন্দর করে সাজিয়ে। কাবলীর নাচ হ'ত বিকেল বেলা।"[১৬] আশরাফ-উজ-জামান যে সময়ের কথা লিখেছেন তা সম্ভবত ত্রিশ-চল্লিশের দশক। চকবাজারে, কমলাপুরে এখনো হয়ত সেই মেলার রেশ ধরে মেলা বসে। তবে ঢাকা শহরেই নয়, ঢাকার বাইরেও ঈদ উপলক্ষে মেলা বসত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বাংলাদেশের মেলার যে তালিকা প্রণয়ন করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, এখনো ঈদ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কমপক্ষে বারোটি মেলার আয়োজন করা হয়।[১৭]

তিন

আগেই বলেছি, ঈদ সম্পর্কে যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে ধরে নেওয়া যায়, রমজান মাস থেকেই শুরু হ'ত ঈদের প্রস্তুতি। এ উৎসাহের শুরু হ'ত রমজানের চাঁদ দেখা থেকে। মনে হয় এটি মুঘল প্রভাবের কারণ এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল শহুরে বিশেষ করে ঢাকার এবং মফস্বল বা গ্রামের সম্পন্ন বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর তেমন যোগ ছিল বলে মনে হয় না। আর রোজা সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের লোকদের ধারণা কি ছিল, তাতো আগেই উল্লেখ করেছি।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ময়মনসিংহে ঈদের কথা বলতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন–"এ অঞ্চলে কোন মসজিদ বা জুমার ঘর ছিল না। বছরে দুইবার ঈদের জামাত হইত বটে কিন্তু তাতে বড়রাই শামিল হইত। কাজেই জামাতে খুব অল্প লোক হইত। ঈদের মাঠে লোক না হইলেও বাড়ি বাড়ি আমোদ-সামুদ হইত খুব। সাধ্যমত নতুন কাপড়-চোপড় পরিয়া লোকেরা বেদম গান বাজনা করিত। সারা রাত ঢোলের আওয়ায পাওয়া যাইত। প্রায়ই বাড়ি বাড়ি ঢোল-ডগর দেখা যাইত।"[১৮]

আবুল মনসুর আহমদের এ তথ্যে নতুনত্ব আছে। কারণ আর কারো রচনায় এ ধরনের বর্ণনা পাইনি। হয়তো আরো অনেক জায়গায় গান বাজনা হ'ত। ঢাক-ঢোল গান বাজনা লোকায়ত উপাদানের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঐ সময়কার ঈদের জামাতের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতেও নতুনত্ব আছে- "ঈদের জামাতেও লোকেরা কাছাধুতি পরিয়াই যাইত। নমাযের সময় কাছা খুলিতেই হইত। সে কাজটাও নমাযে দাঁড়াইবার আগে তত করিত না। প্রথম প্রথম নমাযের কাতারে বসিবার পর অন্যের অগোচরে চুপিচুপি কাছা খুলিয়া নমায শেষ করিয়া কাতার

হইতে উঠিবার আগেই কাছা দিয়া ফেলিত।"[১৯] এ শতকের প্রথম দিকে সিলেটে চাকরিজীবী খানদানী কিন্তু স্বচ্ছবিত্তের একটি পরিবারের ঈদ পালনের সাদামাটা একটি বর্ণনা পাওয়া যায় সাহিত্যিক সৈয়দ মুর্তজা আলীর লেখায়—"ঈদ-শবেবরাতে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মা সিমাই সমুসা পব [ময়দার আবরণে নারকেল কোরা ও চিনি দিয়ে তৈরি মিষ্টি দ্রব্য], আজ ওয়াইন [ক্রোয়ান] রুটি তৈরি করতেন। রুটি তৈরি করা হ'ত ময়দা ও হলুদ গুলে। এগুলি দিয়েই সমুসা পব তৈরি হ'ত। কখনও কখনও রুটি তৈরি করা হ'ত চালের গুঁড়া দিয়ে সমুসাতে দেওয়া হ'ত ভাজা মাছ বা মাংস।"[২০]

মুর্তজা আলীর বড় ভাই সৈয়দ মুস্তফা আলী তাঁর আত্মজীবনীতে আরেকটু বিশদ বর্ণনা রেখে গেছেন-"শীতের দিনে রোযা শুরু হয়েছে। সমস্ত দিনের কর্মসূচি পালটিয়েছে। মা খুব ভোরে উঠে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে রোদে বসেছেন। আমরা সকলে শিউলী ফুলের পাপড়ি ছাড়িয়ে লাল বোঁটা একত্র করছি। মা পাশে বসে সেমাই তৈরি করছেন।... সেমাই ডালার উপর রেখে মা রৌদ্রে শুকোতে দিলেন। শিউলির বোঁটাও রৌদ্রে দিলেন। তারপর মা কাপড় কেটে পাজামার মাপ নিলেন... সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গায়ের জামার মাপ। আমাদের কি আনন্দ! পয়লা রোযা হ'তে নিত্য চললো ঈদের প্রস্তুতি। পঞ্চাশ বছর পূর্বের (১৯১৮-এর দিকে) কথা বলছি।... সন্ধ্যার সময় শিউলীর বোঁটা উঠিয়ে মা একটি বোতলের ভেতর রাখলেন আর সেমাই ভর্তি করলেন বিস্কুটের টিনে।... ঈদের দিন মা রাঁধবেন কোরমা পোলাও। আর জরদাতে দিবেন ঐ শিউলী ফুলের বোঁটার রং-তাতে জরদার শুধু যে রং খোলতাই হবে তা নয়- চমৎকার ঘ্রাণও বেরুবে। আর সেমাই তৈরি হবে-যে সেমাই মা নিজের হাতে সারা মাস ভর করেছেন; আমাদের গায়ে উঠবে মার নিজের হাতে সেলাই জামা পাজামা। মাকে নিয়েই ঈদ আর ঈদের খুশীর সব, তাতে রয়েছে মার হাতের স্নেহের পরশ। এ খুশী ভুলবার নয়।"[২১]

ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলেও ঈদের দিনের একটি চিত্র পাই সৈয়দ মুস্তফা আলীর লেখায়। তিনি জানিয়েছেন সিলেটে এক সময় তাঁদের প্রতিবেশী ছিলেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস মৌলবী দলিল উদ্দীন ঠাকুর। তাঁর বাড়ি ছিল ফরিদপুরের কাসিয়ানী থানায়। ঈদের দিন ধলপহরে ঠাকুর সাহেবের বাসার লোকদের হাঁক ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল মুস্তফা আলীর পরিবারের। কি ব্যাপার? না দুই তিনজন লোক কয়েকটি খাঁঞ্চায় করে কোরমা পোলাও নিয়ে বের হয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করছে, 'আর কোনো বাসা হতে এসেছে কি?'

"—না আসেনি। তাহলে আমরাই ফার্স্ট হলাম। তাদের কি খুশী-তখনও ফজরের আজান হয়নি। আমাদেরকে এক থাপ্পা দিয়ে গেল। পরে শুনেছিলাম তাদের দেশে নাকি এই রেওয়াজ-ঈদের দিন কে কার আগে নাস্তা পাঠাতে পারে। এই নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে এক হৃদ্যতামূলক প্রতিযোগিতা চালু আছে।"[২২]

এ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকের গ্রামাঞ্চলে ঈদ পালনের আরেকটি বর্ণনা পাই খন্দকার আবু তালিবের নিবন্ধ থেকে -"রোজার পনেরো দিন যাওয়ার পর হতেই গৃহবধূরা নানা রকম নক্সী পিঠা তৈয়ার করতে আরম্ভ করত। এদের মধ্যে ফুল পিঠা, পাপর পিঠা, ঝুরি, হাতে টেপা সেমাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শবে কদরের রাতে মেয়েরা মেহদী এনে তা বেঁটে হাতে নানা রকম চিত্র আঁকত। ফুল পিঠা তৈয়ার করার সময় বউয়েরা 'প্রিয় স্বামী', আর অবিবাহিত মেয়েরা 'বিবাহ' ও 'প্রজাপতি' এঁকে রাখত। ঈদের দিনে যুবক-যুবতী বন্ধু-বান্ধবীদের পাতে দেয়ার জন্যেই এ ধরনের ফুল পিঠা তৈয়ার করা হ'ত ... গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে ঈদের 'মিলন' ছিল একটা বড় রকমের উপলক্ষ। ঈদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তখনকার দিনে নানা সমস্যার হ'ত সমাধান। চিরশত্রুও তার শত্রুতা ভুলে যেত।"[২৩]

উপরে যে বর্ণনাগুলি দিলাম তাতে দেখা যায়, ঈদের একটি প্রধান আনন্দ খাওয়া-একটু বিশেষ ধরনের। চাকরিজীবী পরিবারে-মফস্বল বা গ্রামাঞ্চলে খাবারের মধ্যে থাকত কোরমা পোলাও, ঘরে প্রস্তুত নানা রকমের পিঠা, সেমাই ও শিউলি বোঁটার রংয়ে মাখানো জরদা। এখানে লক্ষণীয়, মুঘল খাবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় [লোকায়ত] উপাদান। অবিবাহিত মেয়েরা পিঠার ওপর প্রজাপতি আঁকতেন। এই প্রজাপতি, বহুকাল ধরে বাঙালীদের কাছে বিয়ের প্রতীক, একেবারে লোকজ উপাদান। এ ভাবে, ঈদের খাওয়া-দাওয়ায় মুঘল ও দেশীয় উপাদান মিলে মিশে গিয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। তবে, শহরে এই দেশীয় উপাদানের ছিল অভাব। সে কথায় পরে আসছি। তবে, বলে রাখা ভাল, গ্রামাঞ্চলে একেবারে সাধারণ মানুষ কোরমা পোলাওর কথা কখনও চিন্তা করেনি, এখনও করে না। তাদের ঈদের খাওয়ার তালিকায় প্রধান হয়ে উঠত ঘরে তৈরি মিষ্টান্ন। আসলে, ঈদের পুরো ব্যাপারটার একদিকে ছিল খাওয়া-দাওয়া, অন্যদিকে নতুন কাপড়-চোপড়। ঈদের দিন পরার জন্য মা চাচীরাই প্রধানত ঘরে বসে বাচ্চাদের নতুন কাপড় সেলাই করে দিতেন যার বর্ণনা আগে আমরা পেয়েছি। কামরুদ্দীন আহমেদ জানিয়েছেন, ঈদের দিন সম্পন্ন ঘরের লোকজন পরতেন আচকান, পায়জামা ও জড়োয়া টুপি।[২৪] ডাঃ আবদুল বাসেত লিখেছেন, বরিশালে, বাচ্চাদের জন্যই যেন ছিল ঈদ। কারণ, সেদিন তারা নতুন কাপড় পরত। এবং সে কাপড় ছিল পাঞ্জাবী, আচকান এবং

টুপি।[২৫] ঈদের দিন টুপির এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। আবু তালিব লিখেছেন, 'আমার মনে পড়ে আমার জন্য একটি লাল কাগজের টুপি আনতে বড় ভাইকে চার পয়সা দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ঈদের বাজারে রঙ-বেরঙের কাগজের টুপি প্রচুর পাওয়া যেত। এই টুপিগুলো শুধুমাত্র ঈদের দিনেই ব্যবহৃত হত।'[২৬] নামাজে যাবার আগে বা নামাজ থেকে ফিরে সবাই গুরুজনদের কদমবুসি করে যেত।

এই যে পাজামা-পাঞ্জাবী বা আচকান—এগুলির ব্যবহার শুরু হয়েছিল খুব সম্ভব এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। এবং যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁদের পরিবারের কর্তারা চাকরি করতেন মফস্বল শহরে। গ্রামাঞ্চলে, আবুল মনসুর যেমন জানিয়েছেন, ধুতির প্রচলনই ছিল ব্যাপক। পরে অবশ্য ধুতির জায়গা করে নিয়েছিল লুঙ্গি।[২৬ক]

ঈদের দিন জামাতে যাবার আগে বা জামাত থেকে ফিরে গুরুজনদের কদমবুসি করার ব্যাপারটা এই শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত প্রবল ছিল।[২৬খ] অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠরা গুরুজনদের এ ভাবে জানাতেন শ্রদ্ধা। বাচ্চারাও হুটোহুটি করে করত কদমবুসি। কারণ, এর মধ্যে একটা মজা ছিল। যাকে কদমবুসি বা সালাম করা হ'ত তিনি যে সালাম করছে তার হাতেই কিছু ধরিয়ে দিতেন। এ প্রথা এখনও আছে। তবে হাতে হয়ত এখন আর কিছু ধরিয়ে দেওয়া হয় না। এটিই খুব সম্ভব চালু হয়েছিল হিন্দুদের প্রণামী দেওয়া থেকে।

ঈদের দিন, বিশেষ করে গ্রামে, জামাত যেখানে হ'ত তার চারদিকের সীমানা সাজানো হ'ত রঙ্গীন কাগজের নিশান দিয়ে। মফস্বলে বা গ্রামাঞ্চলে এ রেওয়াজ এখনও বর্তমান।

১৯৪৭-এর আগে, বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকা শহরেই ঈদ যা একটু ধুমধামের সঙ্গে পালিত হ'ত। ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান ও মুঘল শহর। তাই মুঘল-ঈদের প্রভাব ছিল বেশি। তা' ছাড়া, এখানে থাকতেন নওয়াব ও অন্যান্য মুসলমান ধনাঢ্য ও শরীফ ব্যক্তিরা। ফলে ঈদ পেত পৃষ্ঠপোষকতা।

ঢাকার উপরের স্তরে যে রীতিনীতি চালু ছিল তা হ'ল খোসবাস বা সুখবাস সমাজ প্রভাবিত। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন-'ঢাকার সমাজ ব্যবস্থা ও তখনকার তাহজীব-তমদ্দুন মূলত আগ্রারই সমাজ ব্যবস্থা ও তখনকার তাহজীব-তমদ্দুন। কিন্তু এই সমাজ কাঠামোতে ইরানীদের আধুনিক তমদ্দুন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের মাধ্যমে শিয়া মত সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করেছে। এই ধর্মীয় মতবাদটি অজ্ঞাতসারে উর্দুভাষী সুন্নীদেরকেও প্রভাবিত করেছে।'[২৭] উনিশ শতকের শেষার্ধ ও এ শতকের প্রথম দু'তিন দশকের

পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্তব্য করেছিলেন হাকিম হাবিবুর রহমান। এর রেশ ঢাকা শহর থেকে এখনও মিলিয়ে যায় নি। খোসবাস সংস্কৃতির একটি উদাহরণ ছিল ঢাকার ঈদের মিছিল। এ ধরনের মিছিল বাংলাদেশের কোথাও বেরোত না। এ সম্পর্কে জানা যায় আলম মুসাওয়ারের চিত্রমালা থেকে।

আলম মুসাওয়ার নামে এক শিল্পী, খুব সম্ভব উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ঢাকার ঈদ ও মুহররম মিছিলের ৩৯ টি ছবি এঁকেছিলেন, যা রক্ষিত আছে জাতীয় জাদুঘরে। এ চিত্রমালা দেখলে বোঝা যায়, নবাবী আমলের ঢাকার মুহররম ও ঈদ মিছিলের বর্ণাঢ্য রূপ ও ব্যাপকতা। ছবিগুলি দেখে অনুমান করে নিতে পারি, নায়েব-নাজিমদের বাসস্থান নিমতলি প্রাসাদের ফটক থেকে [বর্তমান এশিয়াটিক সোসাইটির পেছনে] বিভিন্ন পথ ঘুরে, চক বাজার, হুসেনী দালান হয়ে সম্ভবত মিছিল আবার শেষ হ'ত মূল জায়গায় এসে। মিছিলে থাকত জমকালো হাওদায় সজ্জিত হাতি, উট, পালকি। সামনের হাতিতে থাকতেন নায়েব নাজিম। কিংখাবের ছাতি হাতে ছাতিবরদার। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ছিল কাড়ানাকাড়া শিঙা। রঙবেরঙের নিশান মিছিলের রূপ দিত আরো খুলে। দর্শকরা সারি বেঁধে থাকতেন রাস্তার দু'পাশের ছাদে। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেশীয়। মুঘল [বহিরাগত], ইংরেজ সাহেব-মেম। রাস্তায় রাস্তায় ফকির যেমন ছিল তেমনি ছিল খেলা-দেখানেওয়ালা।

এ মিছিল কবে শুরু হয়েছিল তা জানা যায় নি। খুব সম্ভব নায়েব নাজিমরা নিমতলি প্রাসাদে এসে যখন বসবাস শুরু করেছিলেন [অষ্টাদশ শতকে], তখন থেকেই এই মিছিলের শুরু। নওয়াবরা খুব সম্ভব এ মিছিলের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ঢাকার বিখ্যাত জন্মাষ্টমী মিছিল থেকে এবং নিজেদের আধিপত্য ও ঈদে জাঁকজমক দেখানোর জন্যে শুরু করেছিলেন তাঁরা এ মিছিল। ঈদের মিছিল আবার কবে ঢাকা থেকে মিলিয়ে গিয়েছিল তাও জানা যায় না। খুব সম্ভব উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার নায়েব নাজিমদের বংশ লুপ্ত হয়ে গেলে, সমাপ্তি ঘটেছিল এ মিছিলের। কারণ, ধনাঢ্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা ব্যতীত এ ধরনের মিছিল সংগঠিত করা দুরুহ। এ শতকের বিশ ত্রিশের দশকে ঢাকায় রমজানের শুরুতেই ঘর-বাড়ি মসজিদ সব সাফ সুতরো করে রাখা হ'ত। রমজানের চাঁদ দেখার জন্য বিকেল থেকেই বড় কাটরা আহসান মঞ্জিল, হুসেনী দালানের ছাদে ভীড় জমে যেত। "চাঁদ দেখা মাত্রই চারি দিক হতে মোবারকবাদ, পরস্পর সালাম বিনিময় এবং গোলাবাজি ও তোপের আওয়াজ হইতে থাকিত।"[২৮]

ঢাকার রমজান ও ঈদের বড় আকর্ষণ ছিল খাবার। রোজায় ঘরে অনেক রকম ইফতারী থাকলেও সবাই একবার চকে ছুটে যেতেন। চক সেই মুঘল আমল থেকেই

ব্যবসা বাণিজ্য খাবার-দাবার আড্ডার কেন্দ্র। চকের ইফতারীর কিছু বিবরণ রেখে গেছেন আবু যোহা নুর আহমেদ। খাবারগুলি ছিল-শিরমলি, বাকেরখানি, চাপাতি, নানরুটি, কাকচা, কুলিচা, নানখাতাই, শিক কাবাব, হান্ডি কাবাব, মাছ ও মাংসের কোফতা, শামী ও টিকা কাবাব, পরটা, বোগদাদী রুটি, শবরাতি রুটি, মোরগ কাবাব, ফলুদার শরবত ও নানারকম ফল। চক এখনও প্রায় সে ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

ঢাকার তোরাবন্দি খাবার ছিল বিখ্যাত। বিশেষ বিশেষ উৎসবে এর ব্যবস্থা করা হ'ত। তার মানে ঈদের দিন রইস আদমীরা তোরাবন্দি খাবারের আয়োজন করতেন। এ ধরনের খাবারের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি আবু যোহা নুর আহমেদের লেখা থেকে "... রইসদের বাড়িতে এইসব খাবার প্রস্তুত হইত। নৌকা বানাইয়া লাল বনাতের নীচে সারি সারি বরতন ও পেয়ালা সাজাইয়া মেহমানদের সামনে এইসব খাবার রাখা হইত। এই খাবারের সারিতে থাকিত চারি প্রকারের রুটি, চারি রকমের পোলাও, চারি রকমের নানরুটি, চারি প্রকারের কাবার, পনির, বোরানি, চাটনি-অর্থাৎ প্রত্যেক পদের খাবার চারি পদের থাকিত। মোট চব্বিশ পদের নীচে থাকিত না।"[২৯]

চার

আগেই উল্লেখ করেছি, ঈদ-উল-ফিত্‌র যেমন বাংলাদেশে বড় কোন ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়নি, তেমনি পালিত হয়নি ঈদ-উল-আজ্‌হাও। ঈদ-উল আজহা পালিত না হওয়ার একটি কারণ সম্প্রদায়গত [উনিশ শতকে] বিরোধ। আজকে আমরা যে 'ধুমধামে'র সঙ্গে ঈদ-উল আজহা পালন করি তা চল্লিশ/পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য মাত্র।

মুসলমানেরা কেন কোরবানী দেয়, এর উৎসই বা কি-এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ তা মোটামুটি সবার জানা। কোরানের সুরা সাফফাত-এ বলা হয়েছে-"তারপর যখন পিতার সঙ্গে কাজ করার মত তার (ইসমাইলের) বয়স হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি; তখন তোমার কি বলার আছে।' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি দেখবেন আমি ধৈর্য ধরতে পারব।'[৩০] যখন তারা দুজনে আনুগত্য প্রকাশ করল ও ইব্রাহীম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইব্রাহীম তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলে।' এ তো

ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা, আমি তাকে ছাড়িয়ে নিলাম এক বড় কোরবানীর বিনিময়ে।' আরো বলা হয়েছে সুরা হজ-এ 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য(কোরবানীর) নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমি তাদের জীবনের উপকরণ হিসেবে যেসব চতুষ্পদ পশু দিয়েছি সেগুলি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়। ... আল্লাহর কাছে ওদের মাংস বা রক্ত পৌঁছায় না। বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা পৌঁছায়।"[৩১]

এই ঈদে উৎসর্গের ব্যাপারটি তাই জড়িত। হজের সময় এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

ঈদ-উল আজহা আমাদের এখানে কোরবানীর ঈদ এবং বিশেষ করে বকরী ঈদ নামেই বেশি পরিচিত। কোরবানীর ঈদ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু বকরী ঈদ? অনেকের ধারণা সুরা বাকারা থেকে 'বকরী' শব্দটি চালু হয়েছে। বাকারা সুরায় গাভী সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তা অন্য প্রসঙ্গে। ঈদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া বকরী মানে আমরা নির্দিষ্টভাবে একটি পশু-ছাগল (খাসী)কেই বুঝি।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এর কারণ অন্য। একশো বা দেড়শো বছর আগে বাংলাদেশে গরু কোরবানী দেয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে হিন্দু জমিদারের অঞ্চলে যেখানে গরু কোরবানী সম্পর্কে তারা বৈরি মনোভাব পোষণ করতেন। কোরবানী যদি কেউ দিতেন তা হলে খাসী বা ছাগলই দিতেন। 'বকারা' মানে গাভী। আরবী এই শব্দটির বিকৃত রূপ হয়েছে 'বকরী'। কিন্তু গরু যেহেতু কোরবানী দেওয়া সম্ভব নয়, কোরবানী দেওয়া হচ্ছে ছাগল, তাই বকরী মানে দাঁড়িয়ে গেল ছাগল। আবুল মনসুর আহমদের আত্মজীবনীতে এর ইঙ্গিত মেলে। প্রায় একশো বছর আগের ঈদ-উল আজহা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন- 'বকরা ঈদে গরু কোরবানী কেউ করিত না। জমিদারদের তরফ হইতে ইহা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল। খালি বকরী কোরবানী করা চলিত। লোকেরা করিতও তা প্রচুর।'[৩২]

মুঘল-পরবর্তীকালে ঈদ-উল আজহা কিভাবে পালিত হ'ত সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে, মীর্জা নাথানের লেখায় ঈদ-উল আজহা সম্পর্কে বিবরণ আছে খানিকটা।

মীর্জা নাথান তখন সিলেটের হবিগঞ্জ থানার তুপিয়া [পুটিয়া]তে। ঈদের দিন তিনি গেলেন তাঁর পিতা ইহতিমাস খানকে শ্রদ্ধা জানাতে। সেখান থেকে পিতাপুত্র যান শাজাত খাঁর কাছে।

ঈদ পালনের জন্য শাজাত খাঁ আয়োজন করেছিলেন বিশেষ করে এক ভোজের। পরদিন ইহতিমাস খাঁও আয়োজন করেছিলেন ভোজের। পানাহারের

সেখানে ছিল প্রচুর্য। মেহমানদের বিভিন্ন ধরনের খানা, মিষ্টি এবং বিশেষ জাতের আপেল দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়েছিল।[৩৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, কোরবানীর কোন কথা নাথান উল্লেখ করেন নি। পরের বছর ঈদ-উল আজহার সময়ও নাথান ছিলেন বাংলাদেশে। ঈদের দিনের বর্ণনা করেছেন তিনি এ ভাবে 'কোরবানীর দিন সব অফিসাররা গেলেন নামাজ পড়তে। ইমামকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন খুত্‌বার সময় বলেন– নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ এবং আবুল মুজাফফর শাহজাহান বাদশাহ, গাজী বিন নুরুদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ। খুত্‌বার সময় ইমাম তাই বললে, আনন্দে নাথান তাঁর সোনার সুতোর কাজ করা আলখাল্লাটি দিয়ে দিয়েছিলেন ইমামকে এবং তাঁর সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পাঁচশো টাকার রেজগি। অনেকে তা কুড়িয়ে নিয়েছিল, শুভেচ্ছাবাণী স্পর্শ করেছিল দিগন্ত। তারপর ঘরে ফিরে নাথান দিয়েছিলেন কোরবানী। রাতে বসেছিল গল্প-বলিয়ে, গায়ক-গায়িকা ও নর্তকীদের আসর।'[৩৪]

আবদুর রহিম এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন, 'ফলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আনন্দ-উৎসব ও ভ্রাতৃসুলভ মনোভাবের ভিতর দিয়ে মুসলিম শাসনামলে ঈদ উৎসবগুলো উদ্‌যাপিত হ'ত।'[৩৫]

আবদুর রহিমের এ ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। কারণ যে ঈদ পালনের বিবরণ দিয়ে গেছেন নাথান, তা ছিল বহিরাগত রইসদের ঈদ পালন, যার সঙ্গে সাধারণের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

এরপর থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ঈদ-উল আজহার আর কোন বিবরণ পাই নি। অবশ্য ফারায়েজী আন্দোলনের আগে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামাত কিনা সন্দেহ।

পাঁচ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা গেছে যে, দেড়শো-দুশো বছর আগে ঈদ মুসলমানদের প্রধান উৎসব হিসেবে তেমনভাবে পালিত না হওয়ার কারণ ছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়া, বিত্তহীনতা বা দারিদ্র্য এবং ঘটনার সমারোহ না থাকা। দু'টি ঈদেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মাঠে গিয়ে নামাজ পড়া এবং তারপর খাওয়া। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন- "মোহররম পর্বে আমাদের বাড়িতে এত ধুমধাড়াক্কা হইলেও দুই ঈদে কিন্তু অমন কিছু হইত না। বকরী ঈদে প্রথম প্রথম দুই তিনটা ও পরে মাত্র একটা গরু কোরবানী হইত।"[৩৬] এটি ছিল উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা।

বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল সাধারণ মানুষ যার দু'একটি উদাহরণ আগেই দিয়েছি। কোরবানী ঈদের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের আরেকটি সংস্কারের কথা উল্লেখ করছি। পৌষ সংক্রান্তিতে গরুর পূজা করা ছিল কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের উৎসবের অঙ্গ। কৃষ্ণকুমার দত্ত লিখেছেন, "প্রাতঃকালে প্রত্যেক বাড়িতে হিন্দু মুসলমান সকলেই গরুগুলিকে স্নান করাইত; গরুর শিং সিঁদুর দ্বারা রঞ্জিত করিত। গরুর গাত্রে মাটির খুরি দ্বারা পিঠাগুলির ছাপ দেওয়া হইত। গরুগুলি চিতে পিঠা পরমানন্দে রোমন্থন করিত। ইহার পর গরু চরাইতে মাঠে যাইতাম।"[৩৭]

এ অবস্থার পরিবর্তন এনেছিল ফারায়েজী আন্দোলন। এর আগে ইসলাম ধর্মে লোকজ উপাদানের আধিপত্য ছিল বেশি, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু রীতিনীতি। এখনও যে একেবারে নেই তা নয়। তবে ফারায়েজী আন্দোলন এতে সৃষ্টি করেছিল প্রবল অভিঘাতের। এ সময়ই বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় উনিশ শতকের প্রথম সত্তর-আশি বছর কেন কোরবানী নিয়ে লোকের তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না। এরপর আসে গরু কোরবানীর কথা। হিন্দু ধর্মে কোথাও নেই যে, গরু খাওয়া যাবে না, সংস্কারে আছে। ঐ বর্ণনা মতে, মুসলমান ধর্মে কোরবানী [গরু] বিধান আছে কিন্তু সংস্কারের কারণে তা হ'ত না। বা বলা যেতে পারে যে, গরুকে অর্চনা করছে হিন্দু-মুসলমান দু'পক্ষই তাকে হত্যা করে কিভাবে?

কিন্তু এ অবস্থা চলেনি বেশি দিন। ফারায়েজী আন্দোলন, বিভিন্ন প্রচারকদের প্রচার, ওয়াজ মাহফিল আঞ্জুমানসমূহের কার্যকলাপের ফলে এ ধরনের অনেক সংস্কার বিলুপ্ত হয়েছিল মুসলমানদের মন থেকে। এবং তখন কোরবানী বিশেষ করে ঈদ-উল আজহায় গরু কোরবানীর ব্যাপারটি বাংলায় এক বিতর্কিত বিষয় হয়েছিল। আজকে আমরা ঈদ-উল আজহায় অনায়াসে গরু বা অন্য কিছু কিনে এনে সহজেই কোরবানী দিয়ে ফেলি, আশি একশো দূরে থাকুক পঞ্চাশ বছর আগেও তা তেমন সহজসাধ্য ছিল না। আজকের প্রজন্ম হয়ত অবাক হবে যে, এ নিয়ে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বিতর্ক চলেছে। এবং কোরবানী বিশেষ করে গরু কোরবানী দেওয়ার অধিকার আমাদের বাপ দাদাদের লড়াই করে আদায় করতে হয়েছিল।

কিন্তু কেন এ বিতর্ক হয়েছিল? হিন্দুদের অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরও সংস্কার ছিল গরুর মাংস না খাওয়া। তারা ছিল সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী। ফলে তারা গরু জবাই-এর ছিল বিপক্ষে। বিশেষ করে যে এলাকা ছিল হিন্দু জমিদারের অধীনে, সে এলাকার কথা সহজেই অনুমেয়। অন্যদিকে গত শতকের শেষের দিকে,

মুসলমানরা বিশেষ করে যাঁদের খানিকটা বিত্ত আছে, ধর্ম কর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা ধর্মীয় বিধান মানার জন্য কোরবানী বিশেষ করে গরু কোরবানী করতে চাইলেন। এটা তাঁরা দেখেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় অধিকার হিসেবে। এর সঙ্গে সম্প্রদায়গত মান-অপমানের ব্যাপারটিও ছিল যুক্ত, ফলে পুরো বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং তা শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। পঞ্চাশ বছরের এ বিতর্কের বিভিন্ন বিবরণ ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা পুস্তিকায়। এসব পড়লে, একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের এলিটদের চিন্তা-ভাবনা, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে, যা সামাজিক ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ধরে নিতে পারি, ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গো হত্যা নিবারণী' সভা স্থাপন করলে শুরু হয়েছিল বিতর্ক। 'গো-হত্যা' বা 'গরু' কোরবানীর বিপক্ষে এ সভা থেকে ভারত জুড়ে চালানো হয়েছিল প্রবল প্রচার। ১৮৮৭ সালে রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার শশিশেখর রায় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে এ পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপন করেছিলেন প্রস্তাব। ফরিদপুর ও বিভিন্ন অঞ্চলেও এ নিয়ে প্রচার শুরু হয়েছিল।[৩৮] তখন এর বিরোধিতা করতে মুসলমানদের বিভিন্ন সভা বা আঞ্জুমানসমূহ এগিয়ে এসেছিল। বিত্তবান হিন্দুদের এ প্রচারণার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা। ঐ সময়কার অবস্থার একটি বিবরণ পাওয়া যাবে ইবনে মাযুদ্দিন আহমদের আত্মজীবনী 'আমার সংসার জীবন'-এ। তিনি লিখেছিলেন- "...গোবিন্দপুর হরিশঙ্করপুর, সনাতন, গোপীনগর, আমলা গোমাঞী পুকুর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম একজন প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত বড় হিন্দু জমিদারের জমিদারীভুক্ত; সেখানকার মুসলমানগণ বহুকাল অবধি গরু কোরবানী করিতে বা গরু জবেহ ও উহার মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না। কেহ করিলে তার আর রক্ষা ছিল না। জমিদার কাছারীর দুর্দান্ত হিন্দু নায়েবগণ কোরবানীদাতা ও গরু হত্যাকারীকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার ও নানা অপমান করিত এবং তাহাদের নিকট জরিমানা আদায় করিত। সুতরাং তাহাদের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল হইতে গো কোরবানী প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল।"[৩৯] মাযুদ্দিন জানিয়েছেন-সভা সমিতি আন্দোলন করে তাঁরা খানিকটা সুবিধা আদায় করেছিলেন। তা হ'ল সাবধানে ও গোপনে গরু কোরবানী করা।

১৮৯৫-এর দিকে জানা যায়, ময়মনসিংহের অন্তর্গত, মুক্তাগাছা ও সন্তোষের জমিদার ঈদ-উল আজহায় গরু কোরবানীর জন্য বেশ কিছু মুসলমানকে জরিমানা করেছিলেন। ১৯০৫ সালে চাঁদপুরে কয়েকজন কোরবানী উপলক্ষে গরু কোরবানী

দিয়েছিল। এর ফলে, জনৈক গোপাল চন্দ্র মজুমদার তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ ছিল মুসলমানরা প্রকাশ্যে রাস্তায় গরু জবেহ করেছে এবং 'বহুজলে' মাংস ধুয়ে জল অপবিত্র করেছে। জেলা হাকিম ছিলেন জগদীশচন্দ্র সেন। তিনি তিনজন মুসলমানকে অভিযুক্ত করে একজনকে এক মাসের জেল এবং অপর দু'জনকে যথাক্রমে পঞ্চাশ ও পনের টাকা জরিমানা করেছিলেন।[৪০]

কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে শেষার্ধে কোরবানী বিশেষ করে গরু জবেহ বিষয়ক বিতর্কটি নতুন মাত্রা পেয়েছিল, যখন প্রখ্যাত মুসলমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন গরু কোরবানীর ['গো হত্যা'] বিপক্ষে হিন্দুদের পক্ষ অবলম্বন করলেন। বিতর্কে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলেন 'আখবারে এসলামীয়া' সম্পাদক মৌলবী নঈমুদ্দীন। মীর মশাররফ হোসেনের যুক্তি ছিল- হিন্দু মুসলমানদের মনের মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই ঐক্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঈদে গরু কোরবানী বা গরুর মাংসের জন্য গরু জবেহ। সুতরাং গরু জবেহ না করলে ঐক্য বিনষ্টকারী প্রধান মাধ্যমটি উৎপাটিত হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'আহমদী'তে তিনি লিখেছিলেন 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' নামে একটি প্রবন্ধ। এরপর লিখেছিলেন আরো চারটি প্রবন্ধ 'গোধন কি সামান্য ধন' ও 'গো মাংস ও গো দুগ্ধ'। তারপর ১২৯৫ সালের এসব প্রবন্ধ একত্র করে প্রকাশ করেছিলেন 'গো-জীবন'। এলাহাবাদের 'গো রক্ষিণী' সভার শ্রী শ্রীমান স্বামীর একটি চিঠি গ্রন্থটিতে দেওয়া হয়েছিল মুখবন্ধ রূপে। মশাররফ হোসেন লিখেছিলেন এ গ্রন্থে-'দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো-জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দু এবং হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্র ধাম মক্কা মোয়াজ্জামায়, পুণ্যক্ষেত্রে বোগদাদে, মোসলমান রাজপ্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, টোকে দিল্লীতে এবং আজমীর শরীফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী, মৌলানা, মহামতীগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সত্বর হয় পুনঃপ্রকাশ হইবে।' এবং এর 'দুই হাজার কপি বিনামূল্যে বিতরিত হইবে।'[৪১]

ঈদ-উল আজহায় গরু কোরবানী না করলেও কেন চলবে তার পক্ষে যুক্তি দিয়ে লিখেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন 'গো-জীবন' গ্রন্থে—"ধর্মে আঘাত লাগে না, গো-মাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চির সহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্মরক্ষা আর যাহা রক্ষা তাহা বারবার বলিব না? ... সাধারণে জানে যে 'ঈদজ্জোহায়' গরু কোরবানী না করিলে ধর্ম বজায় থাকে না, মোসলমানিত্ব রক্ষা পায় না এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি শাস্ত্র দ্বারা দেখাইব, প্রমাণ করিব যে গরু

কোরবানী না দিয়াও ধর্মরক্ষা হইতে পারে। মোসলমানিত্ব অটলভাবে থাকিতে পারে। ... গরু কোরবানী না হইয়া ছাগলও কোরবানী হইতে পারে। তাহাতেও ধর্মরক্ষা হয়। ইহার পরেও একটা কথা আছে যে, একটা ছাগল একজন ভিন্ন দুইজন নিষেধ। কাজেই ব্যয় লাঘবে গরুই অগ্রগণ্য। কিন্তু ভাই, একথা আপত্তি তুলিয়া আমার মুখ বন্ধ করিতে পারিবেন না। কোরবানীর গরুর সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সে প্রকার একটা গরুর মূল্যে ২৫ টি ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। তুমি বৎসর বৎসর যে ২/৩ টাকার মধ্যেই সারিয়া থাক আবার সে ২/৩ টাকার ক্ষতি চামড়া বিক্রয় করিয়াই পূরণ কর। বিনা ব্যয়ে ধর্মরক্ষা। লাভের লাভ তস্য লাভ মাংস। এক যাত্রার তিন লাভ-ধর্মরক্ষা, অর্থরক্ষা, উদর রক্ষা। যাহা হউক তার বেশি বলিতে ইচ্ছা করি না। সকাতরে প্রার্থনা যে, গোকুল বিনাশক এবং গোখাদক নামে যেন আর আমরা অভিহিত না হই। চেষ্টা করিলে উভয় কূলই রক্ষা হইতে পারে।"

গরু কোরবানীর [ও গরুর মাংস ভক্ষণ] পক্ষে এবং মীর মশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন তখন মৌলবী নঈমুদ্দীন। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আখবারে এসলামীয়া'র সম্পাদক। এক জনসভায়, মীর মশাররফকে 'কাফের' এবং তাঁর 'স্ত্রী হারাম' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। 'আখবারে এসলামীয়া' নিয়েছিল এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা। 'কাফের' ঘোষিত হওয়ার প্রতিবাদে, মীর মশাররফ হোসেন মানহানির মামলা করেছিলেন মৌলবী নঈমুদ্দীনের বিরুদ্ধে। তখন আবার 'আখবার' ও নঈমুদ্দীনের পক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন (১৮৮৯ সালে) ঢাকা শহরের কলেজ, মাদ্রাসা, পোগোজ, জুবিলী, জগন্নাথ, সার্ভে, মেডিক্যাল এবং নর্মাল স্কুলের ছাত্ররা। ঢাকায় তাঁরা গরু কোরবানীর পক্ষে আয়োজন করেছিলেন বিরাট সভার। নোয়াখালী ও কুমিল্লায়ও হয়েছিল এ ধরনের সভা। পরে অবশ্য আপোষে মিটে গিয়েছিল এ মামলা।

ঐ সময় এ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল। ওয়াকিল আহমদ তার একটি তালিকা দিয়েছেন। বইগুলি ছিল-'*গো কান্ড*' (১৮৮৯) মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন; '*অগ্নি কুক্কুট*' (১৮৯০) মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আল মাশহাদী, '*গো বধে আপত্তি কেন* (১৯০০) ওহাজুদ্দীন আহমদ; *গোকুল নির্মূল আশঙ্কায় ভারবাসীর নিকট ফকির দীন মোহাম্মদের আবেদন*' (১৯০৪) দীন মোহাম্মদ, 'কলিকাতায় গো কোরবানী হাঙ্গামা' (১৯১১) দীন মোহাম্মদ, 'গরু ও হিন্দু মুসলমান' (১৯১১) আইনুল ইসলাম খন্দকার, 'গরু কোরবানী' ফজলুর রহমান প্রভৃতি।[৪২]

বই-পুস্তিকা মাসিক পত্র ছাড়াও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলিতেও এ নিয়ে কম লেখালেখি হয় নি। ১৮৯০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশ'

লিখেছিল-"মুসলমানদের বকরী ঈদে কোরবানী (কিন্তু গরু কিনিয়া কোরবানীর বিধান নাই) অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন উভয়েরই ধর্মের আদেশ উভয়কে অনুপ্রাণিত করিতেছে। যদি উভয়েই ষোল আনা ঠিক রাখিয়া চলেন তবে হাঙ্গামা ঠোকাঠুকি অপরিহার্য্য। আর যদি আপোষ চাহেন তবে, উভয়েরই কিছু কিছু আবদার ছাড়িয়া দিতে হইবে। হিন্দুরা এখন বলিতেছেন তোমরা কোরবানী করিতে চাও কর,-গোরু ছাড়িয়া বকরী মার, উট মার আপত্তিকর না। কিন্তু গোরুকে মারিলে আমাদের প্রাণে বাজে, দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দাও। মুসলমান বলেন গোরু শস্তা, বকরী মহার্ঘ, বিশেষতঃ গরু কোরবানী আমরা বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছি। গো-বধ দেখিতে না পার, আমরা তোমাদের কাছে গো-বধ করিব না। আমাদের ঘরে কি হয়, কি না হয়, তাহা দেখিবার তোমার কি অধিকার আছে? মুসলমান বাদশাহগণ এই বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন, তাই কোরবানী নিয়া কখনও ভারতবর্ষে হাঙ্গামা হয় নাই। বর্তমান রাজনৈতিকগণ ইহার সামঞ্জস্য করিতে জানেন না। তাইত এত দাঙ্গা, এত হাঙ্গামা আর তাহাদের নির্বুদ্ধির জন্য যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সূত্রপাত হইয়াছে, তজ্জন্য শাস্তি দিতেছেন হিন্দু-মুসলমান।"[৪৩]

গরু কোরবানীর ব্যাপারটা দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জিদে পরিণত হয়েছিল। তার ওপর ঐ সময় দু'সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুনরুত্থান যুগিয়েছিল এতে ইন্ধন। গত শতকের শেষ দিকে বিষয়টি জড়িয়ে গিয়েছিল রাজনীতির সঙ্গে যার ইঙ্গিত করেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'।

এ তো' গেল গত শতকের কথা। কিন্তু এ শতকেও দেখছি গরু কোরবানী নিয়ে উত্তেজনা হ্রাস পায়নি। ১৯১০ সালের সংবাদে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশে গরু কোরবানীতে বাধা দিচ্ছেন স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা। 'বাসনা' লিখেছিল-"অনেক জমিদার মহাশয় কলকাতা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে কাবাব খাইতে পারে কিন্তু আপন জমিদারী মধ্যে মুসলমান প্রজাদিগকে তাহাদিগের ধর্ম্মকার্য্য (কোরবানী) করিতে দেন না। এই শ্রেণীর জমিদার মহাশয়গণ যতদিন তাহাদিগের অন্তঃকরণ প্রশস্ত না করিয়া মুসলমান গরীব প্রজাদিগকে তাহাদিগের ধর্ম্মকার্য্য প্রকাশ্যভাবে করিতে অনুমতি না দিবেন, ততদিন ঐক্য স্থাপিত হইবে না।"[৪৪] ১৯১৭ সালে 'আল-এসলাম'-এ হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের যে চারটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল 'গো কোরবানীতে বাধা প্রদান।' এ পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল-মুসলমান যখন তাঁহাদের নিজের বাড়িতে "গো কোরবানী' কার্য্য সমাধান করেন, কোন সাধারণের গমনের প্রকাশ্য স্থানে করেন না, তখন ইহাতে হিন্দুর বাধা দিবার কোন কারণ হইতে পারে না। তবু মুসলমানদিগকেও বলি তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যের

অনুরোধে সম্ভব 'গো কোরবানী' কার্য আড়ালে সম্পন্ন করিবে।"[৪৫]

১৯২৫ সালে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন একটি পত্রিকায় জনৈক 'রওশন হেদায়েৎ'-"মুসলমান কখনও হিন্দুর দুর্গা পূজায় বাধা দেয় না, কিন্তু মুসলমানদিগের গো কোরবানীতে হিন্দু প্রজাদের মাথা বিগড়ায় কেন?"[৪৬] ন্যায্য প্রশ্ন, কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার আগে এর সন্তোষজনক মীমাংসা হয়নি। ১৯৩০ সালেও দেখি, আকরম খাঁর প্রভাবশালী 'মোহাম্মদী'তে কোরবানীর পক্ষে, 'সঞ্জীবনী' বিপক্ষে লেখা হচ্ছে। তবে, হিন্দু মালিকানাধীন কিছু পত্র-পত্রিকায় গরু খাওয়া যে হিন্দুদের ধর্মবিরোধী নয়, বরং সংস্কার, এ বক্তব্য যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছিল।

১৯০১ সালে 'মোহাম্মদী'তে 'আলোচনা' বিভাগে মওলানা আকরম খাঁ প্রথমে ঐ ধরনের একটি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—"মুসলমানরা যেরূপ বকরী ঈদ উপলক্ষে গো- কোরবানী করেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের আর্যরাও ঠিক সেই ভাবে 'গো-মেধ যজ্ঞ' পালন করিতেন। বকর ঈদ আর 'গো-মেধ যজ্ঞ' প্রায় সমঅর্থবাচক শব্দ তবে কোন দোষযুক্ত গরু কোরবানী করা চলিবে না মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রের তাহার যেরূপ মছলা আছে, হিন্দু শাস্ত্রেও তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।"

'সঞ্জীবনী' আবার এ নিয়ে কটাক্ষ করে লিখেছিল, "ঐসব প্রাচীন তত্ত্ব কেন প্রকাশ করা হইতেছে? হিন্দুকে গো মাংস ভক্ষণ করার জন্য? এদেশে গো-মাংস চলিবে না।"

এরপর লিখেছিলেন আকরম খাঁ-"এদেশের গো মাংস চলিবে না' বলিয়া সহযোগী যে চরম মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, অবস্থা গতিকে তাহার সমর্থন আমরা করিতে পারিতেছি না। কারণ, এখন এদেশে গো মাংস বেশ সচল হইয়া আছে। মুসলমান ও খৃষ্টানের কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দু জাতির বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে আজও যথেষ্ট প্রচলন আছে। বকর ঈদের সময়- গো-মেধ যজ্ঞের প্রসাদ লাভের জন্য এই শ্রেণীর শত শত নর-নারী মুসলমান পল্লীগুলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রধানত এই গো-খাদক হিন্দুরাই আজ মহাত্মা গান্ধীর পরিভাষায় 'হরিজন' বিশেষণ লাভ করিয়াছে। উচ্চ স্তরের হিন্দুদিগের, এমনকি হিন্দু সভার নেতৃবর্গের মধ্যে গো-খাদক হিন্দুর যে একেবারেই অভাব কোন সত্যনিষ্ঠ হিন্দুই বোধ হয় একথা জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না। সুতরাং এদেশে এখনই যখন গো মাংসের প্রসার এতটা বিদ্যমান আছে এবং উচ্চস্তরের শিক্ষিত হিন্দুরা যখন বেদাদি প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্র ও প্রাচীন যুগের ব্যবহার হইতে গো কোরবানীর ও গো মাংস ভক্ষণের বৈধতা সপ্রমাণ করিতে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন 'এদেশে গো মাংস চলিবে

না'-বলিয়া চরম ঘোষণা প্রচার করা সহযোগীর পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"৪৭

গুরুত্বের দিক থেকে ঈদ-উল আজহার ওপর ঈদ-উল-ফিতরের স্থান। কিন্তু, মুসলমানদের আত্মজীবনীতে সেই ঈদ-উল-ফিত্‌রের বর্ণনা প্রায় নেই বললেই চলে। এর একটি কারণ হতে পারে, যাঁরা পরবর্তীকালে আত্মজীবনী লিখেছিলেন তাঁরা ছিলেন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। ঈদ তাঁদের জন্য আনন্দ বয়ে আনত না। ঈদ-উল-ফিত্‌রের যেখানে বর্ণনা পাওয়া যায় না সেখানে ঈদ-উল আজহার বর্ণনা না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ দুটি ঈদের সঙ্গেই আছে বিত্তের সম্পর্ক বিশেষ করে ঈদ-উল-আজ্‌হার সঙ্গে।৪৮

জাহানারা ইমাম তাঁর আত্মজীবনী 'অন্য জীবন'-এ লিখেছেন-"গুরুত্বের দিক দিয়ে ঈদ-উল-ফিত্‌রই সকলের উপরে। অথচ আমার ছোটবেলার স্মৃতিতে রোজার ঈদ খুব বড় হয়ে ফুটে নেই। কারণটা বোধহয় রোজার ঈদে ঘটনার তেমন সমারোহ নেই, যেমনটি আছে কোরবানীর ঈদে।"৪৯ ঘটনার সমারোহ মানে তিনদিন বরাদ্দ কোরবানীর জন্য। তা' যারা কোরবানী দিতে পারতেন, তাঁদের জন্য আনন্দ একটু বেশি ছিল বৈকি। জাহানারা ইমামের পরিবার ছিলেন সম্পন্ন। কিন্তু, সে আমলে অধিকাংশ মুসলমানের পক্ষে, আমার মনে হয় কোরবানী দেয়া ছিল কষ্টকর। দারিদ্র্য ছাড়াও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিপীড়নের ভয়ও ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে।

ঈদ-উল-ফিত্‌রের মত রমজান থেকেই বা এক মাসব্যাপী প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারটা নেই ঈদ-উল আজহায়। এ ঈদে মুখ্য বিষয় কোরবানীর জন্য গরু ছাগল কেনা। অনেকে গৃহপালিত পশু কোরবানী দিতেন, অনেকে ঈদের মাসখানেক আগে কোরবানীর পশু কিনতেন। এ রেওয়াজ এখনও আছে। এর কারণ, আগে কিনলে দামে একটু শস্তা হয়। তাছাড়া ধর্মে বলা হয়েছিল, প্রিয় বস্তু কোরবানী দেওয়া। মাসখানেক একটি গরু/ছাগল পুষলে একটু মায়া বাড়ে [প্রিয় হয়]- সে ধারণাও কাজ করে।

ত্রিশের দশকে মফস্বলের সম্পন্ন পরিবারে কোরবানীর ঈদ কিভাবে পালিত হ'ত তার বিস্তারিত একটি বিবরণ আছে জাহানারা ইমামের গ্রন্থে। অন্য কোন গ্রন্থে ঈদ সম্পর্কে এতো খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে লেখা হয়নি। তাই উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও তুলে দিচ্ছি—"কোরবানীর সময় দেশের বাড়িতে যে চমকপ্রদ উৎসবটা হ'ত, সেটা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট আকর্ষণের ব্যাপার। কোরবানীর সময় তিনটে গরু, গোটা পাঁচ-ছয় ছাগল/খাসী কোরবানী দেওয়া হ'ত। এত বেশি

পরিমাণে পশু কোরবানীর কারণ হ'ল আমাদের গোষ্ঠীর লোকসংখ্যার বহর। ... কোরবানীর সময় আমাদের বাড়িতে চালের আটার রুটি বানানো হ'ত- সে একটা দেখবার মত জিনিস। রসুনের খোসার মত পাতলা রুটি। ধবধবে সাদা এবং সুগোল। বাড়ির মেয়েরা আগের রাত বারোটা একটার সময় দহলিজের সামনের সেই যে কাজী পুকুর- সেই পুকুরটায় গোসল করে আসতেন। কাজী পুকুরের সান বাঁধানো ঘাট ছিল, চারকোণা পুকুরটির পাড়গুলি উঁচু ছিল; পানি ছিল পরিষ্কার টলটলে। রাত দুপুরে পর্দার হানি হবে না বলেই বোধহয় দাদাজানের অমত ছিল না বাড়ির বউ-ঝিদের পুকুরে গোসল করতে দিতে। গোসল করে বাড়িতে এসে নতুন শাড়ি পরে বিবিরা ওজু করে বিসমিল্লা বলে কোরবানীর রুটি বানাতে বসতেন। আগের দিনই ঢেকিতে আটা কোটানো হয়েছে। রুটি বানানো হয় দুশো তিনশো সেই জন্যই বোধ করি আগের রাত থেকে শুরু হ'ত এই ম্যারাথন রুটি বানানো। আমার মা ও দুই চাচী, দাদী, নানী এবং ফুপুরা যাঁরা বকরীদে বাপের বাড়ি আসতেন, তারা সবাই মিলে রুটি বানাতে বসতেন। কয়েকজন পানিতে চালের আটা সিদ্ধ করে খামীর বানাচ্ছেন, অন্য কয়েকজন সেই খামীর মালিশ দিয়ে মোলায়েম করেছেন-একটু সরে তিন-চারজন বেলুন পিড়ি নিয়ে রুটি বেলতে বসে গেছেন, আর কয়েজন চুলোয় তাওয়া দিয়ে সেকঁছেন। বাঁশের পাতলা চটা দিয়ে তৈরি প্রায় এক হাত উঁচু ঘুটি [গ্রামীণ ব্রেড বক্স] চার পাঁচটা আগের দিন ধুয়ে রোদে শুকিয়ে রাখা হয়েছে- সেগুলির রুটি সেঁকে ফেলা হচ্ছে। রুটি যাতে গরম থাকে তার জন্য পুরনো শাড়ি ছেঁড়া কাপড় চার ভাঁজ করে খুঁচির মুখ ঢাকা দেওয়া। এই কাপড়ও আগের দিন খুব ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তুলে রাখা হয়েছে। আমার নয় দশ বছর বয়স থেকে -যখন থেকে আমি রাত জেগে থাকতে পারি, তখন থেকে আমিও মা-চাচীদের এই মধ্যরাত্রির অভিযানে শরিক হয়েছি।

এত বেশি রুটি বানানোর কারণ হ'ল শুধু বাড়ির আত্মীয়-স্বজন নয়, পাড়া-প্রতিবেশী; অন্য পাড়ার জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং গ্রামের অভাবী লোকজন সবাইকেই রুটি হালুয়া গোশত দিতে হবে। বাড়িতেও ক'দিন ধরে কেবল রুটি গোশতই খাওয়া হবে। সে যুগে ঈদ বকরীদের মেহমানরা একালের মেহমানদের মত নাক সিটকে এক চামচ সেমাই বা একটা রুটির কোণা ছিড়ে খেতেন না, তাঁরা বেশ ভালো করেই পেট ভরে খেতেন। খেতে পারতেনও তারা সেকালে। তাই যাঁরা খাওয়াতেন, তাদের আয়োজনটাও এরকম বিরাটই করতে হ'ত। বকরীদের সকালে কোরবানী না হওয়া পর্যন্ত কেউ কিছু মুখে দিতেন না। পুরুষরা গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে নামাজ পড়তে যেতেন খালি পেটেই। ফিরে এসে একেবারে কোরবানী

দিয়ে তারপর বাড়িতে ঢুকতেন। ততক্ষণে মেয়েদের রুটি, হালুয়া, সেমাই, ফিরনী-সব রান্না শেষ।"

কোরবানীর পর ছোটদের লক্ষ্য ছিল গরুর কলজে। গরুর কলজের টুকরো ভিতরে নিয়ে গিয়ে মুরুব্বীরা বাচ্চাদের শিক কাবাব করে দিতেন। তারপর মাংস ভাগ হলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য। জাহানারা ইমাম লিখেছেন "ঝলসানো কলজে দিয়ে যে মহাভোজের সূচনা হ'ত, তা শেষ হ'ত কোর্মা, রেজালা, কোপ্তা, কাবাব, দো-পেঁয়াজা, আলকারী ইত্যাদি পদ নিয়ে, সঙ্গে থাকত কখনো পোলাও; কখনো পরটা এবং সদা সর্বদা সেই চালের আটার বেলা রুটি .... এই ভোজ চলত দুতিন দিন ধরে। তারপরেও ভুনা গোশত খাওয়ার জের চলত দু'তিনদিন ধরে। সেকালে ত' ফ্রিজ ছিল না। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা বউ-বিবিদের মস্তবড় কাজই ছিল বিরাট বিরাট ডেকচি-কড়াইতে রাখা গোশত ভাল করে জ্বাল দেওয়া।.... আমরা কোরবানী শেষে আব্বার কর্মস্থলে যাবার সময় প্রতি বছরই কয়েক টিফিন-ক্যারিয়ার বোঝাই ভুনা গোশত সঙ্গে নিয়ে নিতাম। কোরবানীর গোশত মুহররমের চাঁদে খাওয়া নাকি খুব পুণ্যের কাজ। তাই কিছুটা গোশত খুব যত্নসহকারে জ্বাল দিয়ে রাখা হ'ত"।[৫০]

ঈদ-উল-ফিতরে নতুন জামা পরার রেওয়াজ ছিল এবং আছে। কোরবানীর ঈদে সে ব্যাপার নেই। তবে, দুটি ঈদেই প্রধান আনন্দ/ বৈচিত্র্য হ'ল খাওয়া একটু বিশেষ ধরনের। মফস্বলে সম্পন্ন পরিবারে কোরমা পোলাও ছাড়াও রুটি তৈরির ব্যাপার ছিল। জাহানারা ইমামের বর্ণনায়ও তা আছে। শহরাঞ্চলে এতো রুটি তৈরি করা সম্ভব ছিল না। পোলাও, কোরমাই হ'ত। তবে দু'অঞ্চলেই সদ্য কোরবানীর গোশত তখনই রেঁধে খাওয়ার প্রচলনটি ছিল এবং আছে। তবে, জাহানারা ইমামের বর্ণনায় যে ব্যাপক আয়োজনের প্রস্তুতির বর্ণনা আছে তা খুব সম্ভব কিছুদিনের মধ্যেই লুপ্ত হয়েছিল। এর কারণ, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আর দারিদ্র্য। তবে ঈদ জমকালোভাবে পালন করতে না পারলেও, অনেক মুসলমান তা জমকালোভাবে পালনের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের মধ্যেই এ ভাবটা বেশি ছিল যাঁরা ভাবতেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন বহিরাগত। এ জিনিসটি ফুটে উঠেছে ১৯৩৪-এ 'মোহাম্মদী'তে লেখা কাজী কাদের নওয়াজের ঈদ বিষয়ক একটি কবিতায়...

কিসমিস আঙুর খোর্মার নির্যাস
পান করি অঙ্গেতে দাও আতরেরি বাস।[৫১]

ঈদের জামাত, পোশাক-আশাকের বর্ণনা কোথাও তেমন নেই। আবুল ফজলের আত্মজীবনীতে অবশ্য একটি বর্ণনা আছে। তাঁর বাবা ছিলেন চট্টগ্রামের

জুমা মসজিদের ইমাম। চট্টগ্রামের প্রধান জামাত পড়াতেন তিনি। আবুল ফজল লিখেছেন-"তিনি যখন লালদীঘির মাঠে ঈদের নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন-মাথায় হলুদ বা সবুজ বর্ণের পাগড়ী, মুখে দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি, গায়ে আচকানের উপর সুদীর্ঘ দামী চৌগা, পশ্চাতে অগণিত মুসল্লির সারি, নীরব নিস্তব্ধ নত নেত্রে দাঁড়িয়ে- সামনের রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার চলাচলও বন্ধ, অমুসলমান পথিকেরাও একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছে ইমামের ঋষি-মূর্তির দিকে। প্রাতঃ সূর্যের আলো ঝলমল শিশু রৌদ্রে দীর্ঘ ঋজু দেহে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে কেরাৎ পাঠ শুরু করতেন তখন হাজার হাজার মুসল্লি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ কান পেতে শুনতে থাকতো তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত ঐশী বাণী..।"[৫২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় কিন্তু গ্রাম বা শহরের সাধারণ মানুষের কথা বলিনি। কারণ, কোরবানী ঈদের প্রধান ব্যাপার কোরবানী দেওয়া। আগেই উল্লেখ করেছি, দীর্ঘদিন কোরবানী দেওয়া নিয়ে হয়েছিল বিতর্ক। তা'ছাড়া বিতর্ক যদি নাও [নিষেধাজ্ঞা] হ'ত তা'হলেও বা গ্রামবাংলার কয়জনের পক্ষে সম্ভব ছিল কোরবানী দেওয়া, অধিকাংশের পক্ষেই তা সম্ভব ছিল না। আগেও তারা কোরবানী দিতে পারত না। এখনও নয়।

ইসলাম প্রচারের শুরুতে অর্থাৎ আদিতে বাঙালী মুসলমানরা কিভাবে ঈদ পালন করত তা জানা যায় নি। তবে, বলা যেতে পারে, আদিতে প্রচারকরা আরবে উদযাপিত ঈদের আদিরূপই হয়ত তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সে রূপ গেছে হারিয়ে। কখনো ধর্ম-নেতারা মূল অনুষ্ঠানের সাথে যোগ করেছেন নতুন অনুষ্ঠান, কখনো শাসক শ্রেণীর নির্দেশে যুক্ত হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম, কখনো বা লৌকিক ধর্মের প্রভাব এসেছে লৌকিক আচার নিয়ে।[৫৩]

ফারায়েজী আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনসমূহ পালটে দিতে পেরেছিল বাংলাদেশের মুসলমানদের মন-মানসিকতা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও লৌকিক/স্থানীয় উপাদানগুলি বিভিন্ন সময় যুক্ত হয়েছে ঈদের সঙ্গে [অনেক সময় ধনাঢ্যদের পৃষ্ঠপোষকতায়]। লৌকিক উপাদানের উৎস কৃষিভিত্তিক সমাজ। ঈদে যে লৌকিক উপাদানগুলি যুক্ত হয়েছে তার অনেকগুলি এসেছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও লোকাচার থেকে। এবং হিন্দু ধর্মীয় উৎসব মূলত কৃষিকেন্দ্রিক।

দু'একটির উদাহরণ দেওয়া যাক। ঈদের চাঁদ দেখে সালাম দেওয়া [এটা কি এসেছে সে সময় থেকে যখন প্রাকৃতিক শক্তিকে অর্চনা করত মানুষ], ঈদের রাতে ঢোল বাজিয়ে গান বাজনা [মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে এর কোন স্থান নেই], কদমবুসি করা, মেলা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় যা পূর্বে আলোচনা করা গেছে।

অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় [বা শহুরে] সংস্কৃতিও প্রভাব ফেলেছে এ উৎসবে। ত্রিশ-চল্লিশ দশকে ঢাকায় ঈদের দিনে 'খটক' নাচ অনুষ্ঠিত হ'ত। আশরাফ-উজ-জামান লিখেছিলেন, রমনার মাঠে তা অনুষ্ঠিত হ'ত। সম্প্রতি আবদুস সাত্তার জানিয়েছেন, না শুধু রমনার মাঠেই নয়, আরমানিটোলা মাঠ বা অন্যান্য মাঠেও তা হ'ত মনে হয়। ঢাকা শহরে তখন বেশ আধিপত্য ছিল কাবুলিঅলা মহাজন বা ফেরিঅলাদের। আবদুস সাত্তার আরো উল্লেখ করেছেন-"কিছুদিন বর্ষাকালে দেখেছি নৌকা বাইচ। আষাঢ়ের অনুকূল হাওয়ায় দেখেছি শিশু-কিশোরদের ঘুড়ি ওড়ানো। চৈত্র সংক্রান্তিতে ঢাকার ঘুড়ি উড়ানো উৎসব ছিল বিখ্যাত। রমনার মাঠে ঘোড়ার রেস... মহল্লায় মহল্লায় হিজরা নাচ..."[৫৪] রেস ও হিজরা নাচ ছিল ঢাকার বাবু কালচারের অঙ্গ যা যুক্ত হয়েছিল ঈদ উৎসবের সঙ্গে।

এ শতকের শুরু থেকে, যখন রাজনৈতিকভাবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন থেকেই গুরুত্ব পেয়েছিল ঈদ। তবে, খানিকটা জাঁকজমকের সঙ্গে তা পালন করা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল শহুরে বিত্তবানদের মধ্যে।

বাংলাদেশে দু'টো ঈদ জাতীয় ধর্মোৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হবার পর। তখন থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে ঈদ এবং এখনো যা অব্যাহত ও প্রবল। ইসলাম সম্পর্কে আগের অজ্ঞতাও তেমন নেই মুসলমানদের ভেতর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান প্রধান দেশে ঈদ নিজের স্থান করে নিয়েছে।

ঈদ-উল-ফিত্‌র প্রধানত এক দিনের উৎসব এবং তা সীমাবদ্ধ বিশেষ খাবার ও নতুন কাপড়-চোপড় তৈরির মধ্যে, ঈদ-উল আজ্‌হা তিন দিনের এবং তা সীমাবদ্ধ খাবার, বিশেষ করে কোরবানীর মাংস খাওয়ার মধ্যে। এ মাংসও আগের মতো জমিয়ে রাখা হয়। শহরাঞ্চলের বিত্তবানরা এখন প্রায়ই কোরবানীর মাংস ব্যবহার করেন 'কোল্ড বীফ' তৈরি করতে। গ্রাম বা শহরের মধ্যবিত্তরা যতদিন পারেন জ্বাল দিয়ে রাখেন মাংস, অনেক ক্ষেত্রে প্রিয়জনের জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুটো ঈদ পালনের মধ্যে আছে বিত্তের সম্পর্ক। স্বাভাবিকভাবেই শহরে, মফস্বলে ও গ্রামাঞ্চলে যারা বিত্তবান তাঁদের ঈদ আর সাধারণ মানুষের ঈদে পার্থক্য থাকবেই।

বাংলাদেশের ধনাঢ্যরা এখন ঈদ-উল-ফিত্‌র পালন করেন নতুন জামাকাপড় ক্রয়, উপহার বিতরণ এবং বিশেষ খাবারের আয়োজন করে। নব্য পুঁজিপতিদের অনেকে আবার ঈদ উপলক্ষে এখন চলে যান ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর বা হংকং।

সাধারণ চাকুরিজীবীদের অধিকাংশের ঈদ মানে সারা দিনের জন্য ঘরে ফেরা, পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়া, সন্তান বা স্ত্রীর জন্য ফুটপাত বা হকার্স

মার্কেট থেকে কাপড় কিনে নেওয়া বা ঈদের দিন একটু উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করা।

যে বিত্তের কথা বললাম তার সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ ঈদ-উল আজ্‌হার। কারণ, এ ঈদে কোরবানীর জন্য গরু বা ছাগল লাগবেই।

পঞ্চাশ বা ষাট দশকে অনেক মধ্যবিত্তের পক্ষে, নিদেন পক্ষে একটি খাসী কোরবানী দেওয়া সম্ভব ছিল। কারণ, তা পঞ্চাশ থেকে একশো টাকার মধ্যে পাওয়া যেত। গ্রামে অনেকে পোষা খাসী বা গরু কোরবানী দিতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর বিত্তবান ও বিত্তহীনদের তফাৎ চোখে লাগার মতো প্রকট হয়ে উঠেছে। কোরবানী এখন দিতে হচ্ছে সামাজিক মর্যাদাসূচক প্রতীক হিসেবে।

গ্রামে এখন কোরবানী সীমাবদ্ধ ধনী মাঝারি চাষীর মধ্যে। শহরের পেশাজীবীদের অধিকাংশই গরু ভাগে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাও এখন অনেকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিত্তবান যাঁরা, তাঁরা ভাগে নয়, খাসীও নয়, গরুই কোরবানী করেন; অনেক ক্ষেত্রে খাসী এবং গরু দুটোই। এবং সেটা খোদাকে অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ভালোবেসে নয়, ধর্মের কথা ভেবে নয়, বরং প্রতিবেশীদের দেখানো যে, আমি এতো টাকার গরু কিনে কোরবানী দিচ্ছি।

কোরবানীর আগেই বিভিন্ন জায়গায় বসবে গরুর হাট। হৃষ্ট-পুষ্ট দামী গরুর গলায় ঝোলানো হয় কাগজের মালা। বিত্তবান সে গরু কেনেন। বিত্তবানের ভৃত্য বা অনুচর কাগজের মালা ঝোলানো সে গরু নিয়ে আসেন। পথচারীরা জিজ্ঞেস করেন, 'কত'? মনিবের গর্বে গর্বিত পরিচালক দাম বলেন। কিছুদিন আগের ঘটনা। পত্রিকার সংবাদে জানা গেল, এক ব্যবসায়ী একটি গরু কিনেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায়। কোরানে যে ভালবেসে উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে তা এখানে অনুপস্থিত। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে এখন আর তার আবেদন নেই। ধর্ম ব্যবহৃত হয় প্রতিপত্তি ও অর্থ-প্রদর্শনের হাতিয়ার ও প্রতীক রূপে। ধর্মভিত্তিক দলসমূহ এবং রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের প্রতিদিন এত নসিহত করেন, কিন্তু এই অপচয়, এই অশ্লীল অর্থ-প্রদর্শনের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ। কারণ তাঁরা এদের মদত যোগান বা এদের তাঁদের প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আগেও যেমন বঞ্চিত ছিলেন ঈদের আনন্দ থেকে, এখনও বঞ্চিত আছেন তেমনি। মুঘল আমলে দেখি, রইসরা ঈদের দিন ছুঁড়ে দিচ্ছেন রেজগি আর সাধারণ মানুষ তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। এখনো তার হেরফের হয়নি। বরং বঞ্চনা আরো বেড়েছে। সম্প্রতি, সৌদী আরবের কোরবানীর মাংস নেওয়ার জন্য যে হুটোপুটি, লাইন, তা আমাদের দেশের কোন্ দিকটা তুলে ধরে?

রমজান যে খুশীর ঈদ আনে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয় কারণ, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য সারা বছরই প্রায় রমজান। নজরুল যেমন লিখেছিলেন "জীবনে যাদের হররোজ রোজা..."। ঈদ-উল-ফিতর সাধারণ মানুষের জন্য ভাল খাওয়া নয়, নতুন কাপড়-চোপড়ও নয়। তাদের ঈদ জামাতে গিয়ে শুধু নামাজ পড়া। এবং ঈদ-উল আজহাও তাই। জামাত থেকে ফিরে এসে বিত্তবানদের দেওয়া মাংসের জন্য অপেক্ষা। উৎসব সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে তখনই যখন বিত্তবন্টনে আসে সামঞ্জস্য। তা না হলে এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবেরও মূল আবেদন হ্রাস পায়, ধর্ম পালন হয় না, ধর্ম ব্যবহৃত হয় শুধু আত্মপ্রদর্শনের হাতিয়ারে।

তথ্যনির্দেশ

১. বাহারউদ্দিন, 'ইসলামি পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব', *দেশ*, কলকাতা, ৫.৯.১৯৮৭, পৃ. ৪৯-৫৬
২. ঐ
৩. ঐ
৪. James Wise, '*Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*', London, 1885.p. 36
৫. কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত*, কলকাতা, ১৯৪৭
৬. আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, ঢাকা, ১৩৭৮, পৃ. ২৩-২৪
৭. উদ্ধৃত, এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, পৃ. ৩০৮
৮. Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi* [Translated by M.I. Borah], Vol. I, Assam, 1936, p. 110
৯. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*
১০. Baharistan-i-Ghaybi',p.110
১১. এম. এ. রহিমের গ্রন্থ, পৃ. ৩০৮
১২. ঐ, পৃ. ৩০৮-৩০৯
১৩. ঐ
১৪. Jadunath Sarkar, *Bengal Nawabs*, Calcutta, 1952, p. 8
১৫. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, [অনুবাদ: আ. ম. ম. শরফুদ্দীন], ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২০১
১৬. আশরফ-উজ-জামান, 'থিয়েটার যুগের ঢাকা', ঈদ-সংখ্যা *বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২০৯:

অধ্যাপক দীন মুহম্মদ ঐ সময়ের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, গ্রামে ঈদের দিন বিকেলে মাঠে হাডুডু আর লাঠি খেলা হতো। আয়োজন করা হতো ঘোড় দৌড়, যাড়ের লড়াই ও ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা।
ঈদের দিনও তার পরের দিন রাতে বড় বাড়িতে পুঁথি পড়তও ধুম পড়ে যেতো। আর ছিল গ্রামোফনের রেকর্ড শোনা, বিশেষ করে আব্বাসউদ্দিনের গলায় নজরুলের লেখা: ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে/এলো খুশীর ঈদ.. 'কাজী দীন মুহম্মদ', 'আমার ছেলে বেলায় ঈদ', *দৈনিক বাংলা* (বিশেষ সংখ্যা, ঈদ-উল-ফিতর), ১৯৯২
১৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রঃ, *বাংলাদেশের মেলা*, ঢাকা, ১৯৮৩
১৮. আত্মকথা, পৃ. ২৩
১৯. ঐ, পৃ. ৩০
২০. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *আমাদের কালের কথা*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ. ৪৮; S.C. Dey, Sylhet, Calcutta, 1880
২১. সৈয়দ মুস্তফা আলী, *আত্মকথা*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৯-১০
২২. ঐ, পৃ. ২৬
২৩. খন্দকার আবু তালিব, 'ঈদ ঃ আমাদের কালের কথা', সাপ্তাহিক ঢাকা, ঈদসংখ্যা, ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ২৮
আশরাফ সিদ্দিকী, 'সে যুগের ঈদ', *দৈনিক বাংলা*, ঈদু-উল-ফিতর সংখ্যা, ১৯৯৩
২৪. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ২৬
২৫. ডাঃ আবদুল বাসেত, *গাঁয়ের নাম মির্গাখালী*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২২
অধ্যাপক দীন মুহম্মদ লিখেছেন, গ্রামে ঐ সময় লেসওয়ালা রুমি টুপি বা টার্কিশ ক্যাপ ছিল অভিজাতদের। যাদের জোটে না অর্থাৎ যারা লেস কফচুনেট তাদের দেখতাম এক পয়সা দামের রঙিন কাগজের টুপী পরতে, যা একদিনেই শেষ হয়ে যেত। জরির কাজ কাসিদা টুপিও ছিল। এরপর হলো 'আমানুল্লাহ' টুপি। তারপর আমানুল্লাহ সাহেবের টুপির নকল। পাকিস্তান আমলে জনপ্রিয় হয় জিন্নাহ টুপি।"
কাজী দীন মুহম্মদ, ' আমার ছেলেবেলার ঈদ', *দৈনিক বাংলা* (ঈদ-উল-ফিতর বিশেষ সংখ্যা), ১৯৯২ ;
২৬. খন্দকার আবু তালিবের প্রবন্ধ, পৃ. ২৯
ক. অধ্যাপক দীন মুহম্মদ লিখেছেন, নতুন লুঙ্গি কেনাও ছিল উৎসবের অঙ্গ- "এক ছিল পিস্তল মার্কা লুঙ্গি। তার জুড়ি নেই এর সঙ্গে পাল্লা দিত মাদ্রাজের 'পলেসামুকিনা' লুঙ্গি ও সিঙ্গাপুরের জরিপ মার্কা লুঙ্গি।"
কাজী দীন মুহম্মদ, 'আমার ছেলে বেলার ঈদ', *দৈনিক বাংলা* (ঈদ-উল ফিতর বিশেষ সংখ্যা), ১৯৯২;
খ. পায়ে ধরে সালামের কথা লিখেছেন অধ্যাপক দীন মুহম্মদ। "জামায়াতে যাওয়ার আগে বাড়ির সবাইকে সালাম করে দোয়া নিতাম; বখশিসও পেতাম। সালাম করার পর ইফতার করতাম। রমজানের দিনে সন্ধ্যা বেলার মত ঈদের দিন সকাল বেলার এ সামান্য খাবারকে 'ইফতার' বলা হয়। ঈদের দিন সকাল বেলার ইফতারে রমজানের

ইফতারের মত বেশি পদ থাকতো না। এতে থাকতো দুধে ভিজানো ঘুরমা আর বিভিন্ন রকমের সেমাই ও ঘুরি।" ঐ

২৭. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *হাকিম হাবিবুর রহমান*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২১-২২
২৮. আবুয় যোহা নূর আহমদ, *উনিশ শতকের সমাজ জীবন*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬১
২৯. ঐ, পৃ. ৭-৭১
৩০. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *কোরানসূত্র*, ১৯৮৪, পৃ. ২০৫-২০৬
৩১. ঐ
৩২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রঃ, *আত্মকথা*
৩৩. *Baharistan-I-Ghaybi*. p. 170
৩৪. *Ibid*. Vol. II. p. 742
৩৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রঃ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*
৩৬. *আত্মকথা*, পৃ. ২৩
৩৭. *আত্মচরিত*, পৃ. ৩৩
৩৮. ওয়াকিল আহমদ., *উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৮৩, পৃ. ৪০-৫১
৩৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রঃ ইবনে মাসুদ্দিন আহমদ, *আমার সংসার জীবন*, কলকাতা, ১৯৭৪
৪০. ওয়াকিল আহমদের *গ্রন্থ*, পৃ. ৪২
৪১. ঐ, পৃ. ৪৫
৪২. ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯
৪৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৯০
৪৪. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৫৫-২৬৭
৪৫. ঐ
৪৬. ঐ
৪৭. ঐ
৪৮. ঈদ-উল-ফিতর ইসলামি অনুষঙ্গে এই ঈদ-উস সগীর ছোট ঈদ দ্র.ঃ বাহারউদ্দিনের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ
৪৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রঃ *অন্য জীবন*, ঢাকা, ১৯৮৫
৫০. ঐ
৫১. *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭/৮ পৃ. ২৫৬
৫২. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, চট্টগ্রাম ১৯৮২
৫৩. আতোয়ার রহমান, *উৎসব*, ঢাকা, ১৯৯২
৫৪. আবদুস সাত্তার, *ঢাকার ঈদ*, ১৯৮৮, পৃ. ২১

মুহররম

বাংলাদেশে তো মুহররমের জাঁকজমক হওয়ার কথা ছিল না। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সুন্নী, মুহররমের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ। যাঁরা গোঁড়া সুন্নী, তাঁদের কাছে মুহররমের অনেক আচার-অনুষ্ঠান পৌত্তলিকতার সামিল, যদিও শিয়ারাও মুসলমান। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়েছে মুহররম, এখনও যার রেশ বিদ্যমান।

সুন্নীরা বিশ্বাস করেন এক আল্লা ও শেষ পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এ। শিয়ারাও যে তা অবিশ্বাস করেন না, তা' নয়, কিন্তু তাঁরা এও বিশ্বাস করেন, হযরত আলী ও তাঁর দুই পুত্র হাসান- হোসেনের মধ্যেও পড়েছে 'ঐশ্বরিক প্রজ্ঞায়'। তাঁরা বিশ্বাস করেন ইমামতন্ত্রে। আয়াতউল্লাহ খোমেনী তাই শিয়াদের কাছে ইমাম তো বটেই 'রুহউল্লাহ'ও, যার অর্থ 'ঈশ্বরের আত্মা'। ইসলাম তো বটেই, সুন্নীদের কাছে এ ব্যাখ্যা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সম্প্রতি প্রকাশিত, 'ইসলামি পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব' প্রবন্ধে বাহারউদ্দিন যা লিখেছেন তা যুক্তিযুক্ত।-"প্রাচীন ইরানীরা বিশ্বাস করত, রাজার মধ্যেই বিকশিত হন ঈশ্বর। রাজাই ঈশ্বরের মানবিক বিকাশ। অতএব রাজার সামনে অবনত হওয়া, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলা প্রতিটি প্রজারই কর্তব্য। রাজাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অবতার। প্রাচীন ইরানের এই অবতারতত্ত্ব নির্মূল করতে পারেনি ইসলাম। বরং ইসলামী বিশ্বাসে ইরানী অবতারতত্ত্বকে চাপিয়ে দেওয়া হয় শিয়া মতবাদের মাধ্যমে।... ইমামতত্ত্বেই আশ্রয় নিল অবতারতত্ত্ব। বংশ পরম্পরায় ইমামই শিয়াদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। একমাত্র তাঁর সাহায্যেই মুক্তি পেতে পারেন বিশ্বাসীরা। এই ইমামতত্ত্বের জোরেই '৭৯ সালে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ইমাম শাসিত কঠোর শিয়া ইসলাম প্রবর্তিত হয় ইরানে।"[১]

শিয়া মতবাদ গড়ে উঠেছিল ইরাকে, কারণ, ইমাম হোসেন শহীদ হয়েছিলেন সেখানে। আদি শিয়ারা তাই ইরাকী ও আরব বংশজাত। এ শতকের প্রথম দিকে ইভার ল্যাসী নামে এক গবেষক এ সব অঞ্চলে মুহররম সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা চালিয়েছিলেন। তাঁর মতে, অতি প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে অসিরিস, অ্যাডোনিস, তামুজ এবং আরো অনেক দেবতার পূজো প্রচলিত ছিল। বিশ্বাস করা হ'ত এসব

দেবতারা প্রবল তাপে পানি না পেয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দেবতার শব নিয়ে তাই বের হ'ত মিছিল। ল্যাসির বিশ্বাস হাজার বছর আগের সেই পূজা/উৎসব পালন পদ্ধতির সঙ্গে মুহররমের তেমন কোন অমিল নেই। অর্থাৎ মুহররম পালন প্রভাবিত হয়েছে ঐ সব অঞ্চলে হাজার বছর ধরে প্রচলিত বিশ্বাসে। তবে, এই হাজার বছরে স্বাভাবিকভাবেই পদ্ধতিগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বহিরঙ্গে অনেক কিছু বদলে গেছে। কিন্তু মূল একই থেকে গেছে অর্থাৎ অসিরিস, অ্যাডোনিস ও তামুজের রহস্যের প্রতি বিশ্বাস। এবং এ বিশ্বাসের সঙ্গে আবার জড়িত ছিল ঋতু ও ফসল রোপণ।[২]

৯৬২ খৃস্টাব্দে প্রথম পালিত হয়েছিল মুহররম এবং তার দু'শতক পরও খুজিস্তান, আরমেনিয়া, মেসোপটেমিয়ার আশে পাশে প্রচলিত ছিল অ্যাডোনিস তামুজের পূজা।[৩]

পশ্চিম এশিয়া, বিশেষ করে সিরিয়া ও ইরানে এ সময় ছিল গ্রীক চার্চের প্রভাব। যীশুকে তাঁরা দেখেন এমন একজন মহাপুরুষ হিসেবে যিনি মানুষের পাপের ভার নিজের কাঁধে নিয়ে মানব-মুক্তির জন্যে শহীদ হয়েছিলেন। "গ্রীক চার্চের বিশ্বাসে হোসেনের আত্মবলি সংক্রান্ত জন-বিশ্বাস প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।"[৪]

মুহররম প্রবলভাবে পালিত হয় ইরান, সিরিয়া, ইরাক ও লেবাননে। এবং সেটা স্বাভাবিক। কারণ, সেখানে শিয়া সম্প্রদায়ের আধিপত্যই বেশি। এসব এলাকার শিয়া-বিশ্বাস বা মুহররম সংক্রান্ত আচার-বিধি প্রভাবিত করেছে লোক ও বিভিন্ন কাল্টের বিশ্বাস।

শিয়ারা ছাড়া তাদের বিরোধীরাও পালন করতেন মুহররম। ল্যাসি জানিয়েছেন, ইরানে মুহররমের প্রচলন হয়েছিল চতুর্দশ শতকে। সে সময়, হাসান হোসেনের সঙ্গে অন্য যাঁরা শাহাদত বরণ করেছিলেন তাদের জন্যও শোক প্রকাশ করতেন সুন্নী ও অন্যরা। তাতাররাও একইভাবে তা পালন করে যার নাম আরদাবিল। মিশরে মুহররম জড়িত নববর্ষের সঙ্গে এবং এখন আর তা শোক দিবস নয়, পরিণত হয়েছে পুরোপুরি আনন্দ উৎসবে।[৫]

গ্রুনবউমের মতে, মুহররমের মিছিল যদিও এখন শুধু কেন্দ্রীভূত শিয়াদের মধ্যে, কিন্তু হোসেনের জন্য শ্রদ্ধা জড়িয়ে গেছে সুন্নী বিশ্বাসে। ফাতিমীরা (৯৬৬-১১৭১) হোসেনের মস্তক নিয়ে গিয়েছিলেন কায়রো এবং সেখানে তা কবর দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন এক মসজিদ, যা এখনো সব সম্প্রদায় দেখে শ্রদ্ধার চোখে। মুহররমের মিছিলে, তিনি লিখেছেন, শুধু দেখা যায় পুরুষদের, কিন্তু, হোসেন-মসজিদে আশুরার

দিন শুধু দেখা যায় মহিলাদের। ঢাকার হোসেনী দালানে একদিন যে শুধু মহিলাদের আসর বসে মুহররমের সময় তার উৎস কি সেখান থেকে?[৬]

মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ করে, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিয়া মতবাদ বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে, এখানে বলে রাখা ভালো, মুঘল সম্রাটরা ছিলেন সুন্নী এবং সুন্নী মতবাদকেই তাঁরা করেছিলেন উৎসাহিত। প্রকাশ্যে উৎসাহিত করেন নি তাঁরা শিয়া মতবাদকে। আওরঙ্গজেব এদের বলতেন 'বিধর্মী', 'অর্ধার্মিক'। সম্রাট শাহজাহানের সময়, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শাহ্ সুজার সুবেদারী আমলে শিয়ারা আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন বাংলায়। সুজা নিজে সহানুভূতিশীল ছিলেন শিয়াদের প্রতি। এবং তাঁর আমলে প্রধানত ইরান থেকে অনেক শিয়া পরিবার ভাগ্যান্বেষণে চলে এসেছিলেন বাংলায়। তাঁরা লাভ করেছিলেন বিভিন্ন রাজপদ, ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্জন করেছিলেন বিত্ত এবং নিজেদের অনেকে উন্নীত করতে পেরেছিলেন অভিজাত পর্যায়ে। এ কারণে, সুন্নী অধ্যুষিত অঞ্চলেও শিয়ারা ছিলেন প্রভাবশালী সম্প্রদায়। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে মোবারক উদদৌলা সবাই ছিলেন শিয়া সমর্থক। সিরাজ-উদ-দৌলা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ইমামবাড়া।

শুধু তাই নয়, মুহররম শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন নবাবরা। এবং মুহররমের ব্যয় নির্বাহ হ'ত সরকারি কোষাগার থেকে। ইংরেজ আমলে তা রহিত করা হয়েছিল। তাও দেখা যায়, ১৭১৭ সালে রেজা খাঁ মুহররম পালনের জন্য দু'হাজার টাকার আবেদন জানালে সরকার তা মঞ্জুর করেছিল।[৭]

ঢাকার নায়েব নাজিমরা ছিলেন শিয়া, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে শিয়া আধিপত্য হয়ে উঠেছিল ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে প্রবল।[৮] ইমামবাড়া নির্মিত হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়।

বাংলাদেশে ঢাকা ছিল মুহররম পালনের প্রধান কেন্দ্র। কারণ ঢাকা ছিল নায়েব নাজিমদের বাসস্থান, প্রশাসনিক কেন্দ্র। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন- "ঢাকার জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি মূলত আগ্রারই জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি। কিন্তু, এই কাঠামোর উপর ইরানীদের আধুনিক ও সজীব সংস্কৃতি অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে।"[৯] তিনি অবশ্য, ঢাকায় আঠারো-উনিশ শতকে বসবাসরত উচ্চবর্গের পরিপ্রেক্ষিতেই এ মন্তব্য করেছিলেন।

বাংলাদেশে মুহররমের প্রচলন হয়েছিল কবে? নির্দিষ্ট সময় অবশ্য বলা যাবে না। ধরে নিতে পারি, মুঘল আমলে, সতের শতকে বাংলাদেশে প্রচলন হয়েছিল

মুহররমের, বিশেষ করে ঢাকায়। গ্রামাঞ্চলেও হয়ত তখন কোথাও কোথাও তা পালিত হ'ত। তবে মনে হয়, গ্রামাঞ্চলে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকে। যদিও মুহররম শোকের মাস, মুহররম মানেই আমাদের মনে হয় বিষাদ, কিন্তু বাংলাদেশে তা এখন শুধু বিষাদ নয়, খানিকটা উৎসবও, যেমন, মিশরে।

মুহররম নিয়ে রচিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে পুথি। এমনি সময় তো বটেই, মুহররমের মাসে তা সুর করে পড়া হয় নিয়মিত। তবে মনে হয়, মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশের [১৯৮৫-৯১]?পর বাংলাদেশে নতুন মাত্রা পেয়েছিল মুহররম।

ইতোমধ্যে আমরা অবশ্য অবগত যে, বাংলাদেশে যে মুহররম পালিত হ'ত বা হয় তার প্রবর্তক প্রধানত ইরানের শিয়ারাই কিন্তু, আচার-অনুষ্ঠানে কালক্রমে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন এখানকার হিন্দু ও লোকায়ত নানা আচার-বিধি, যা আবার এ অনুষ্ঠানকে দিয়েছিল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। যেমন, জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় মুহররমের মিছিলে শবযান থাকে দু'টি। পারস্য বা ইরানে একটি। বাঙালী মুসলমান বিশ্বাস করেন, আলীর দুই ছেলেই শাহাদত বরণ করেছিলেন একই দিনে [হয়ত এ কারণেই বলা হয় 'হায় হাসান! হায় হোসেন!']। এবং আশুরার দিন রোজা রাখা হয় তাঁদের দু'জনের স্মৃতিরই সম্মানে। কিন্তু আসল ঘটনা তো তা নয়। হাসানকে বিষপানে হত্যা করা হয়েছিল মদীনায় ৬৭০ খৃস্টাব্দে। আর হোসেন শাহাদত বরণ করেছিলেন কারবালায় ৬৮০ খৃস্টাব্দে।[১০]

এখানে বলে রাখা ভালো, মুহররম শিয়াদের উৎসব হলেও সব সম্প্রদায়ের লোকজনই তাতে অংশগ্রহণ করতেন। শিয়ারা ধর্মীয় কারণে, অন্যেরা জাঁকজমক বা আনন্দের জন্য। কিন্তু তা অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে নয়। কারণ, ধর্ম নিয়ে সাধারণের তেমন কোন জ্ঞানও ছিল না, ছিল না ঔৎসুক্যও [দ্রঃ বাংলাদেশে ঈদ]।

ঢাকা ব্যতীত, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মুহররম পালন সম্পর্কে তেমন প্রাচীন তথ্য আমরা পাই না। যা কিছু তথ্য পাই তা উনিশ শতকের। উনিশ শতকের শেষার্ধে জেমস ওয়াইজ লিখেছিলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমান-গ্রামে বেশ কিছু দিন ধরে তাজিয়া তৈরি করা হচ্ছে। এবং প্রত্যেকটি গ্রাম চায় তাদের তাজিয়া প্রতিবেশী থেকে জাঁকালো হোক।[১১]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিলেট অঞ্চলে মুহররম পালনের একটি বর্ণনা পাই বিপিনচন্দ্র পালের (জ. ১৮৫৮) আত্মজীবনীতে। তাঁর শৈশবকালীন সেই স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, তাঁদের "ছোটবেলায় সবচেয়ে জাঁকের অনুষ্ঠান

হল মুহররম .... মুহররমের সময় মুসলমানরা কেমন ঘোরের মধ্যে থাকত।"[১২] বিপিনচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, শহরে মুসলমানদের আখড়া ছিল এবং এই আখড়াগুলিই উদ্যোগ নিত মুহররম পালনের এবং তাজিয়া ও মিছিলও সব বের হ'ত এখান থেকে। "মুহররম মাসের এক থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত গান বাজনায় সারা শহর ভরে থাকত। শেষের পাঁচ দিন তাজিয়া নিয়ে লাঠি তরোয়াল খেলার প্রদর্শনী দেখতে বাজারে প্রচুর লোক যেত। আশেপাশের গ্রাম থেকে মিছিল আসত ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে মারামারিও হ'ত। গোলমালের ভয়ে পিতা রাত্রিবেলা এই মিছিল দেখতে যেতে দিতে চাইতেন না। আমরা অবশ্য লুকিয়ে ছড়িয়ে দূর থেকে দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে পালাতাম। শেষ অর্থাৎ দশম দিনে শহরেরও গ্রামের সমস্ত তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা ঈদগা ময়দানে জমায়েত হ'ত। এটি শহরের বাইরে একটি উন্মুক্ত মাঠ। পিতা স্বয়ং আমাদের সেদিন নিয়ে দেখতে যেতেন। ঈদগা শহরের অন্যতম সুন্দর জায়গা। চারপাশে জয়ন্তীয়া পর্বতমালার নানা আকারের ছোটবড় পাহাড়ে ঘেরা একটি উন্মুক্ত স্থান।... আমরা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নীচের সব মিছিল ও তাজিয়া নিয়ে যে যার নিজস্ব জায়গায় দাঁড়াচ্ছে দেখতে পেতাম। পুলিশ হাঙ্গামা বাঁচাতে আগে থেকেই জায়গা নির্দিষ্ট করে দিত। বাড়ি থেকে মাদুর শতরঞ্জি ইত্যাদি নিয়ে আপামর লোক নিরাপদ দূরত্বে বসে এই প্রদর্শনী দেখত। তখন পাহাড়ের জঙ্গলে বাঘ থাকত। শহরের হৈ চৈ চীৎকারের মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে বাঘের গর্জন শুনতে পেতাম।... আমরা চাইলেও অন্ধকার হয়ে গেলে পিতা আমাদের এদিক ওদিক বেড়াতে দিতেন না। কেননা মোমবাতির আলোকে নদীর ওপার থেকে আসত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জমকালো শোভাযাত্রাটি[১৩] বিপিনচন্দ্র আরো উল্লেখ করেছেন, সবাই ধরেই নিতেন, মুহররমের সময় খানিকটা গণ্ডগোল হবেই। শহরের মুসলমানরা কিছুটা শান্ত ছিল। কিন্তু গ্রামের, বিশেষত সুরমা নদীর পারের 'খিত্রা' গ্রামের এক মাইল লম্বা, আট মানুষ চওড়া মিছিল যখন লম্বা লম্বা তেল চুকচুকে বাঁশের লাঠি হাতে 'আল্লা' 'আল্লা' 'দীন' 'দীন' রবে ছুটে ছুটে আসত ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠত। এক একবার আমরা যখন বাড়ি ফিরে আসছি স্বপ্নময় চাঁদনী রাতে, পথে এই মিছিল দেখতাম। এই চলন্ত উন্মত্ত মানবপ্রবাহে গুঁড়িয়ে যাবার ভয়ে আমরা পথের ধারের গর্তে লুকিয়ে পড়তাম। স্থানীয় রাজন্যদের বেশ কঠিন সময় যেত মিছিল সামলাতে।"[১৪] বিপিনচন্দ্র তাঁর পিতার কাছে শুনেছিলেন, এই মুহররমের মিছিল নাকি 'জন কম্পানির' আগেও বের হ'ত। হতে পারে, মুঘল আমলের শেষের দিকে প্রচলিত হয়েছিল এ উৎসব। তবে তখন "ভোঁতা তরোয়াল লাঠি নিয়ে নয়, রীতিমত 'টোটা' বা বারুদ ভর্তি বাঁশের বন্দুকের মত মারণাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন আখড়ার মধ্যে

প্রতিযোগিতা হত। এই উন্মত্ত খেলার ফলাফল হিসেবে মুহররমের পরে ঈদগায় কত লোকের যে মাথা ভাঙত তার ইয়ত্তা নেই—লাশই পড়ে থাকত দুটি একটি।"[১৫]

সৈয়দ মুর্তাজা আলীও তাঁর আত্মজীবনীতে প্রায় একই কথা লিখেছেন। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সিলেটে পালিত হ'ত মুহররম। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন, শহরে তখন শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো লোক ছিলেন না, মুর্তাজা আলী যে সময়ের কথা লিখেছেন, তা এ শতকের প্রথম দিক। শিয়ারা যেহেতু ছিলেন না, তাই মুহররম পালন করতেন সুন্নীরা। 'মুহররমের দশ দিনের শেষের দিকে রাত্রে শহরের ভিন্ন ভিন্ন মহল্লা থেকে লাঠিয়ালগণ তাদের খলিফার (নেতার) নেতৃত্বে বন্দর বাজারের চৌমাথার কাছে সমবেত হয়ে লাঠি ও আগুনের মশাল দিয়ে খেলা দেখাত। ... মুহররমের দশম দিন রাত্রে ঈদগার সংলগ্ন ময়দানে এই খেলা হ'ত। তখন অনেক তাবুতও আনা হ'ত। শহরের পূর্ব প্রান্ত থেকে যে সকল খেলোয়াড় আসত, তাদের বলা হত রায়নগরী। পশ্চিম দিক থেকে আগত দলকে বলা হ'ত ধরমপুরী। এই উভয় দলে তুমুল প্রতিযোগিতা হ'ত। প্রত্যেক দলের খলিফা তাঁর দলবর্তী লাঠিয়ালদের সাজ পোশাকের দিকে দৃষ্টি রাখতেন।"[১৬] 'খিত্তা' বা খিট্টা' গ্রামের মিছিলের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি, তবে তাদের তখন নদী পেরিয়ে শহরে আসতে দেওয়া হ'ত না। খুব সম্ভব তাদের হিংস্রতার জন্য।

সিলেটের মুহররম পালন সম্পর্কে আরেকটি কৌতূহলজনক তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৬৯ সালে। 'ছাতকের সংবাদদাতা' সংবাদপত্রে জানিয়েছিলেন, আগে নিয়ম ছিল, মুহররমের শেষ দিন যখন লাঠি ও তরবারী খেলা হ'ত, তখন সেখানে কেউ জুতো পায়ে যেতে পারত না। ম্যাজিস্ট্রেট পরে এ নিয়ম রহিত করেছিলেন।[১৭]

সম্প্রতি বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপবিভাগ থেকে ঢাকা শহর, মানিকগঞ্জ ও অষ্টগ্রামের মুহররম উৎসবের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের মুহররম পালন সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু জানতে পারি।

প্রথমেই ধরা যাক অষ্টগ্রামের কথা। কিশোরগঞ্জের হাওড়বেষ্টিত এলাকা এটি। অষ্টগ্রামের পুরোনো জমিদার বাড়ি-'হাওলী বাড়ি' [হাবেলী বাড়ি] কে কেন্দ্র করেই পালিত হয় মুহররম। এই জমিদার পরিবারের একজন উত্তরাধিকারী আলাই মিয়া বা সৈয়দ আবদুল করিমের সময় ১৮৩৬ সালে ইংরেজ সরকার বাকি খাজনার দায়ে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে। আলাই মিয়া তখন সংসার ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে সাধক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সাধক-খ্যাতি লাভের পর তিনি ফিরে এসেছিলেন জমিদার বাড়িতে এবং বাড়ির

আঙ্গিনায় স্থাপন করেছিলেন একটি ইমামবাড়া। সেই থেকে [আনুমানিক উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে] অষ্টগ্রাম ও আশেপাশের এলাকার মুহররমের কেন্দ্র 'হাওলী বাড়ি'। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে অষ্টগ্রামে শিয়া সম্প্রদায়ের কেউ নেই। সুন্নী মুসলমানরাই তা পালন করেন। যেমনটি তাঁরা করে আসছেন গত দেড়শ বছর ধরে। এবং এ অনুষ্ঠানে হিন্দুসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও অংশগ্রহণ করেন।

মুহররমের চাঁদ উঠার আগে থেকেই অষ্টগ্রাম ও আশেপাশের এলাকায় মুহররম পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিটি বাড়িতে সাধ্যমত চাল-চিড়া কুটে রাখা হয়। কারণ চাঁদ ওঠার পর বারো দিন পর্যন্ত ঢেঁকিতে ধানচাল কোটা নিষিদ্ধ। মুহররমের চাঁদ দেখার পর খাট-পালংক কেউ ব্যবহার করেন না, মাটিতেই আসন গ্রহণ করেন বা শয্যা পাতেন। শুধু তাই নয়, সেদিন থেকে তাঁরা রোজা রাখেন। বয়স্ক পুরুষরা চুল দাড়ি ছাঁটেন না, বা কেউ জুতো খড়ম পায়ে দেন না, নখ কাটেন না, ভালো পোশাকও পরিধান করেন না। প্রতি রাতে সুর করে শুরু হয় জারি গান। গানের শেষ পর্যায়ে গায়করা নিজ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে নিজ নিজ মহল্লা বা দরগার [ইমামবাড়া] সামনে এসে গান শেষ করেন। মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ আশুরার পূর্বদিন পর্যন্ত এ ধরনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এ পর্যায়ে আরো আছে মাটি বা কাগজের ঘোড়া, তাজিয়া ইত্যাদি তৈরি ও শিরণী বিতরণ।

অষ্টগ্রামের প্রতিটি মহল্লায় মুহররম পালনের জন্যে আছে একটি স্থায়ী দরগা। এ দরগা মাটির উঁচু বেদী, যার ওপর টিন বা ছনের ছোট ঘর তোলা হয়। প্রতি দরগায় থাকেন একজন খাদেম এবং মুহররমের সময় দরগাগুলি সাজানো হয়। সন্ধ্যায় জ্বালানো হয় মোমবাতি, আর চড়া সুরে বাজানো হয় ডংকা। ডংকার শব্দ শুনে রোজাদাররা ইফতার করেন।

আশুরার দিন বিভিন্ন মহল্লা থেকে মহল্লা প্রধানের নেতৃত্বে বিভিন্ন মিছিল এসে জমা হয় কেন্দ্রীয় ইমামবাড়া 'হাওলী বাড়ি'তে। এদিন আলাই মিয়ার মাজারটিও সাজানো হয়। প্রতিটি দল ইমামবাড়া ও মাজার প্রদক্ষিণ করে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে প্রায় সারা রাত মাতম করে জারী গান গায়। দশই মুহররম আবার মাতম করতে করতে অষ্টগ্রামের পূর্বে 'কারবালা ময়দানে' তাবুত, দুলদুল, তাজিয়া উৎসর্গ করেন। কিন্তু, সন্ধ্যের পরই সবাই মাজার ছেড়ে চলে আসেন। কারণ, অষ্টগ্রামবাসীর বিশ্বাস, রাত আটটার পর জ্বীনরা এসে কারবালার মাঠে মাতম করেন। মুহররমের একাদশ ও দ্বাদশ দিনে মহিলারা মাতম শোক জারি করে মুহররম অনুষ্ঠান শেষ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মুহররমের এই বারো দিন, বিভিন্ন অঞ্চলের সম্প্রদায় নির্বিশেষে কারবালার 'মাঠ দরগা' ও 'হাওলী বাড়ি দরগায়' মনের ইচ্ছা পূরণের আশায় মানত

করেন। মানতের মধ্যে আছে জীবন্ত ঘোড়া, ফলমূল থেকে টাকা পয়সা। যে সব জীবন্ত ঘোড়া উৎসর্গ করা হয় সেগুলি পরিচিত 'দুলদুল' নামে,এবং সেগুলি ধর্মের ষাঁড়ের মতো যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, ফসল নষ্ট করে। ফসল নষ্ট করলে ক্ষেতের মালিক ক্রুদ্ধ না হয়ে বরং খুশিই হয়, কারণ তা নাকি সৌভাগ্যের লক্ষণ।

মানিকগঞ্জের বিভিন্ন গন্ডগ্রামেও পালিত হয় মুহররম। তবে এ অঞ্চলের মুহররমের কেন্দ্র গড়পাড়া ইউনিয়নের আলীনগর গ্রামের ইমামবাড়া। আলীনগর গ্রামে ইমামবাড়া হলেও এটি পরিচিত গড়পাড়ার ইমামবাড়া নামে।

প্রায় একশ বছর আগে গড়পাড়ার এই মুহররম অনুষ্ঠানের শুরু। এটি শুরু করেছিলেন আলীনগর গ্রামের মওলানা শাহ আবদুর রহমান। তাঁর স্ত্রী ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। সে প্রভাবেই তিনি ইমামবাড়া তৈরি করে মুহররম পালন শুরু করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে মানিকগঞ্জে গড়পাড়া ইমামবাড়াকে কেন্দ্র করে যাঁরা মুহররম পালন করেন তাঁরা কেউই শিয়া নন, সবাই সুন্নী।

মুহররমের চাঁদ ওঠার দিন থেকে গড়পাড়া বা মানিকগঞ্জে শুরু হয় মুহররম উৎসব। ইমামবাড়াতে ডংকা বাজিয়ে ঘোষণা করা হয় মুহররমের সূচনা-পর্ব। এদিন থেকে ইমামবাড়ার প্রধান [পীর] ও তাঁর মুরিদরা নিরামিষ খেয়ে রোজা রাখা শুরু করেন। রাতে শুরু হয় মর্সিয়া এবং সেদিন থেকে ভক্তরা মানত আদায় করতে থাকে। কোন্ এলাকা থেকে, কোন্ পথে, কি কি নিয়ে মিছিল আশুরার দিন আসবে ইমামবাড়াতে, তা পীর সাহেব আগে থেকেই ঠিক করে দেন। নবম দিনে ইমামবাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের মর্সিয়া মাতম। একে 'সখিনার বিবাহ' অনুষ্ঠানও বলা হয়। আশুরার দিন বিভিন্ন অঞ্চলের মিছিল এসে জমা হয় ইমামবাড়ায়, তারপর তা রওয়ানা হয় দেবেন্দ্র কলেজের মাঠে। সেখানে লাঠি খেলা ইত্যাদি চলতে থাকে রাত বারোটা পর্যন্ত। কোন কোন বছর এ মিছিল মাইল তিনেক পর্যন্ত লম্বা হয়। মিছিল আসে রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বগুড়া প্রভৃতি দূরাঞ্চল থেকে।[১৮]

ইতিহাস-নির্ভর আমাদের অনুসন্ধানে বাংলাদেশের যে কয়েকটি অঞ্চলের (ঢাকা ব্যতীত) মুহররম পালন সম্পর্কে তথ্য উদ্ধার করা গেছে তার মধ্যে সিলেটের বিবরণটি পুরনো, এবং অষ্টগ্রাম ও মানিকগঞ্জের বিবরণটি সাম্প্রতিক কালের। তবে, অনুমান করে নিতে পারি, বিভিন্ন অঞ্চলে, গত শতকে এভাবেই মুহররম পালিত হ'ত। কোথাও হয়ত জাঁকালোভাবে, কোথাও বা কম জাঁকালোভাবে। মুহররম পালনের রীতিনীতিতে অঞ্চলভেদেও হয়ত খানিকটা তারতম্য থাকত। তবে তাজিয়া নির্মাণ ও আশুরার মিছিলে তেমন কোন হেরফের হয়ত ছিল না।

শুরু থেকেই ঢাকা ছিল মুহররম পালনের কেন্দ্র। কারণটিও স্বাভাবিক। মুগল আমলে ঢাকায় আধিপত্য ছিল শিয়াদের, তা' ছাড়া ঢাকা ছিল নায়েব-নাজিমদের বাসস্থল।

ঢাকায় মুহররম পালনের মূল কেন্দ্র ছিল [এবং এখনও আছে] শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবাড়া হুসেনী দালান। তবে, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, কবে থেকে ঢাকায় মুহররম পালিত হচ্ছে, তা তেমন নির্দিষ্ট করে জানা যায় নি। অধ্যাপক দানী অবশ্য জানাচ্ছেন যে, ঢাকায় বেশ কিছু ইমামবাড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং তা থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই ঢাকায় বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে মুহররম উদযাপিত হ'ত।[১৯] বর্তমান শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত ছিল, এখন যা প্রায় গতশ্রীমহিমা। আজিম -উশ-শান উল্লেখ করেছেন, ঢাকার সবচেয়ে পুরনো ইমামবাড়া ছিল ফরাশগঞ্জের বিবিকা রওজা মহল্লায়। জনৈক আমীর খান তা নির্মাণ করেছিলেন ১৬০০ সালে, অর্থাৎ ঢাকায় ইসলাম খাঁর রাজধানী স্থাপনের পূর্বে। আজিম-উশ-শান এই তারিখের ভিত্তি উল্লেখ করেন নি। ফলে এটি নিশ্চিতভাবে মেনে নেওয়া মুশকিল। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, ১৮৬১ সালে জনৈক পার্সী আর. এম. দোসানজী এটি আবার সংস্কার করেছিলেন।[২০] পার্সীর সঙ্গে শিয়াদের সম্পর্ক খুব নিকটের বলে মনে হয় না।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছেও ছিল একটি ইমামবাড়া [হুসেনী দালান]। ১৮৬৯ সালের ঢাকার মানচিত্রে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে পুরনো হুসেনী দালান বলে। ফুলবাড়িয়ার কাছে ছিল মীর ইয়াকুবের হুসেনী দালান। আর দুটো পুরনো হুসেনী দালান ছিল ছোট কাটরা এবং মুকিম কাটরায়।[২১]

বর্তমান যে হুসেনী দালানটি আমাদের কাছে পরিচিত, তার তারিখ নিয়েও বিতর্ক আছে। সমস্ত যুক্তি বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে, সুবাদার মোহাম্মদ আজমের সময় মীর মুরাদ বর্তমান হুসেনী দালানের জায়গায় একটি ইমামবাড়া নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নওয়ারা মহলের দারোগা ও অট্টালিকাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক। মীর মুরাদ মুহররমের সময় দুঃখীদের এখানে অন্নদান করতেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নায়েব-নাজিম জেসারত খান পুনর্বার হুসেনী দালানটি নির্মাণ করেছিলেন। হতে পারে, মীর মুরাদের ইমামবাড়াটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তাই সেটি ভেঙ্গে জেসারত খান ইমামবাড়াটি পুনঃনির্মাণ করেছিলেন, যা বর্তমানের হুসেনী দালান। টেলর জানিয়েছেন, ঢাকার নায়েব নাজিম বছরে আড়াই হাজার টাকা পেতেন মুহররমের সময় হুসেনী দালানে উৎসব পালনের জন্য।[২২]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিমতলি প্রাসাদ থেকে হুসেনী দালান দূরে অবস্থিত নয়। নায়েব-নাজিমরা হয়ত সেখানে প্রায়ই যেতেন, তত্ত্বাবধান করতেন। ঢাকার শিয়াদের ওপর স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল। নওয়াব নুসরাত জঙ্গ, নওয়াব শামসুদ্দৌলা, নওয়াব কামরুদ্দৌলা ও নওয়াব নাজমৌদ্দৌলার কবরও এখানে। এসব কিছু মিলিয়ে উনিশ শতকে বর্তমান হুসেনী দালানই শিয়া সম্প্রদায়ের উপাসনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

নায়েব-নাজিমদের বংশ লুপ্ত হলে ঢাকার নতুন নবাব পরিবার খাজা আলিমুল্লাহর পরিবার হুসেনী দালানের মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৩] ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে বর্তমান দালানটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে নওয়াব আহসানউল্লাহ তা আবার সংস্কার করে দিয়েছিলেন।

ঢাকার মুহররম পালন সম্পর্কিত সবচেয়ে পুরনো যে সংবাদটি যোগাড় করতে পেরেছি, তা ১৮৫০ সালের। ঢাকা থেকে জনৈক ভ্রমণকারী ১৮৫০ সালে কলকাতার 'রস সাগর' পত্রিকায় মুহররমের একটি বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন যা উদ্ধৃত করা হয়েছিল 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'। এখানে বিবরণটি তুলে দিচ্ছি তা থেকে ঢাকার মুহররম উৎসব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে "মুসলমানের মুহররম পর্ব। সর্বত্র প্রচার আছে মুর্শিদাবাদে এবং ঢাকায় আশুরায় মহাসমারোহ হয়, অতএব আমি উক্ত পর্বে এখানে যাহা ২ দেখিয়াছি সংক্ষেপে লিখি, বিদিত হইবেন, হোসনে দেওয়ালাখ্যা চতুর্দিগ প্রাচীরবদ্ধ এবং মনোহর আলয় আছে,উক্ত বাটী নবাবের বাটীর দূরবর্তী আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত উক্ত মসজিদে বৈকালে দেখিলাম বেগম বাজার হইতে হোসনি দালান পর্যন্ত রাজমার্গে দুই পার্শ্বে অসংখ্য দিন-দরিদ্র অন্ধ পঙ্গু দুঃখী লোকেরা সম্মুখে বস্ত্র বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাবৎ মুসলমানেরা মসজিদ হইতে প্রত্যাগমনকালে চাউল, কড়ি, পয়সা যাহার যাহাছেনচ্ছা কাঙ্গালিদিগের সম্মুখস্থ বস্ত্রচয়ে নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছে, পরন্তু ঐ অপূর্ব পুরী মধ্যে গিয়া দেখিলাম প্রায় সহস্রত্রয় মেঠাই ইত্যাদির দোকান বসিয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে অবস্থিত সরোবরের দক্ষিণ দিগে ভদ্রলোকের বসিবার জন্য ধাপার কুতঘরের ন্যায় তক্তা দ্বারা পাটাতন করা উচ্চ ঘর সুচারু আসনাদিতে সজ্জীভূত দেখিলাম। আমরা পূর্বশ্রুত ছিলাম পাদুকা লইয়া হোসেনি দালানে যাইতে নিষেধ, কিন্তু আমরা পাদুকা সহিত ঐ মসজিদে প্রবিষ্ট হওয়াতেও কেহ কিছু বলিলেন না, গৃহ মধ্যে দেখিলাম বহুমূল্যের এক সিংহাসন স্থাপিত রহিয়াছে এবং তাহার নিকট স্বর্ণবিনির্মিত মহম্মদীয় ধর্মানুসারে দ্রব্যাদি রহিয়াছে, তাহাতে আরবী ভাষায় কোরানের কয়েক পদ লেখা আছে। ঐ সিংহাসনের নিকট সকলে সরায় করিয়া সিন্নি দিতেছে। হোসেনি

দেওয়ালের পূর্বদিগে নবাব নসরত জঙ্গ বাহাদুরের কবর। লোকে ঐ কবরের নিকটেও সিন্নি দিতেছে। রজনীযোগে ঐ ধামে বহুমূল্যে ঝাড়দিতে আলোকময় হয় এবং মোল্লার মরচি আদি গীত করে, হোসনি দেওয়ানে মুহররমের কয়েক দিবস এ রূপ নানা কান্ড দেখা যায় এবং তোপগন্তের দিবস বহুসংখ্যক পতাকা, হাতি ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া মান্য ২ মোগলেরা চকের চতুর্দ্দিগে বেড়াইয়া পুনঃ উক্ত মসজিদে গমন করেন, শেষ দিবস পিরখানার দিনে সকলে কারবোলায় (আজিমপুরে?) যান এবং তথা ঐ উপলক্ষে অতিশয় জনতা হয়। এবং উক্ত নবাব নসরত জঙ্গের গোরের কথা যে উল্লেখ করিলাম তাহার নিকটে অনেক লোকে মানতা করে অর্থাৎ যদি কাহার কাঁঠাল বৃক্ষ ফলবান না হয় সে আসিয়া তথায় বলে 'নবাব সাহেব আমার গাছে কাঁঠাল হইলে প্রথম ফলটি আপনাকে দিব।"[২৪] দ্বিতীয় বর্ণনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে, ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ'-এ। এখানে সেটিও উদ্ধৃত করছি—"এখানে হোসেনী দালান নামক একটা প্রাচীন দালান আছে। ইহা মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্বানুষ্ঠানের আদর্শ স্থান। মহরমের সময় ঢাল, তরবারি এবং অন্য নানা প্রকার ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা ইহার মধ্যভাগ উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়া থাকে। এবং দালানের প্রাচীরের কোন কোন স্থল কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত অথবা মসী দ্বারা রঞ্জিত করা হয় ... মুহররমের সময় হোসেনী দালানের চারদিকে একটা বাজার বসিয়া যায়। যতদিন ১০ম দিবস অতীত না হয়, ততদিন রাত্রি-দিনের মধ্যে প্রায় এক মুহূর্তকালও বাজার অবরুদ্ধ হয় না। যখন যাও, তখনি ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, দেখিতে পাইবে। রাত্রিকালে হোসেনী দালান আলোক-মালায় বিলক্ষণ সুশোভিত করা হয়। হিন্দুদিগের চৈত্রোৎসব নিকটবর্তী হইলে অনেক সামান্য লোকে যেমন ভজন শিক্ষা করিয়া থাকে, অদ্রূপ মুসলমানরাও তেমন মুহররমের সময় নিকটবর্তী হইলে 'ইয়া হোসেন' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে অভ্যাস করে ... জারী গানের চীৎকার ধ্বনি এবং করাঘাতের দুপ-দাপ শব্দে মুহূর্তের মধ্যে কর্ণ বধির প্রায় হইয়া উঠে। ইহাদিগের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের অভাব থাকে না।... ৭ম দিবস পর্যন্ত এইরূপ ধুমধাম চলিতে থাকে। ৮ম দিবস তোপগন্তের দিন। এই দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে হোসেনী দালান হইতে একটি মিছিল বাহির হয়। মিছিলের অগ্রভাগ কয়েকটি হস্তী এবং কতকগুলি পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হয়। পতাকাধারীর পশ্চাৎভাগে কতকগুলি বাদ্যকর থাকে। তৎপশ্চাতে কয়েক ব্যক্তি লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং তরবারী চালাইতে চালাইতে চলে। তৎপর দুইখানি শিবিকা দৃষ্ট হয়। শিবিকার পশ্চাৎভাগে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য শোক প্রকাশ করিতে করিতে যায়। তৎপর একদল গায়ক একটি শোকসূচক গান গাইতে গাইতে দর্শন পথে উপস্থিত হয়।

অনন্তর একটি সুসজ্জিত অশ্বে হোসেনের কৃত্রিম শব লইয়া যাওয়া হয়। শবের চারদিকেই বীজন হইতে থাকে। এতৎপশ্চাতে একটা আহত অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বশেষে কয়েকজন মোদ্দল শোকসূচক কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া আরব্য ভাষায় একটি গান গাহিতে এবং বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে যাইতে থাকে। নবম দিবস রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত চকের মাঠে যষ্ঠি ক্রীড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে। ১০ম দিবসে ঢাকার পশ্চিম ভাগে একটা কল্পিত কারবালার ময়দানে তাজিয়াসহ গমন করিয়া মহররম পর্ব্ব শেষ হইয়া যায়।

... আমরা কোন কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম, অনুসন্ধান করিয়াও জানিলাম, কায়েতটুলি প্রভৃতি স্থানবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে মহরমের সময় মুসলমানদিগের ন্যায় উপবাসাদি করিয়া থাকে। এবং কেহ কেহ মৎস আহার করে না।"[২৫]

আলম মুসাওয়ার নামে এক শিল্পী, খুব সম্ভব উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার ঈদ ও মুহররম মিছিলের ৩৯টি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিগুলি জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। এ থেকে বোঝা যায় নবাবী আমলের ঢাকার মুহররম [ও ঈদ] মিছিলের বর্ণাঢ্য রূপ, ব্যাপকতা। রাস্তায় রাস্তায় ফকির যেমন ছিল, তেমনি ছিল খেলা-দেখানেওয়ালা। হুসেনী দালানের একটি ছবিতে দেখা যায়, হুসেনী দালানকে সাজানো হয়েছে। এর চত্বরে বসেছে মেলা। সেখানে হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকই আছেন।

সবশেষে হাকিম আহসানের একটি বর্ণনা তুলে দিচ্ছি, এ বর্ণনা এ শতকের প্রথমার্ধের। 'জাদু' পত্রিকায় প্রকাশিত এ বর্ণনাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক দানী।

'মহররমের চাঁদ দেখার পরই শুরু হয় মহররমের অনুষ্ঠান। চাঁদ দেখার রাত থেকেই হোসেনী দালানের নহবৎখানা থেকে শুরু হয় নহবৎ বাজানো। মজলিসও শুরু হয় ঐ সময় থেকে। প্রথম তিন রাত হোসেনী দালানের প্রাচীরে জ্বালানো হয় অসংখ্য মোমবাতি। অনুষ্ঠান জমে ওঠে চতুর্থ দিন থেকে। ভাটিয়ালি মার্সিয়া [ভাটিয়ালির সুরে শোক গাথা] শোনার জন্য হোসেনী দালানের বারান্দা ওঠে ভরে। গানের জন্য বিশটি মহল্লাকে 'হাদি' ও 'গিরওয়া' নামে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক পক্ষ গান করে প্রশ্ন রাখে অন্য পক্ষ গানের মাধ্যমে তার উত্তর দেয়। মার্সিয়া গায়করা দল বেঁধে আসে, প্রতি দলের সামনে থাকে নিশান যা পরিচিত অরণি নামে। ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন পোড়ানো হয় বিভিন্ন মহল্লায় আতশবাজী। মার্সিয়াতে সুন্নী, শিয়া দু'সম্প্রদায়ই যোগ দেয়।

মহররমের পঞ্চম দিন ভিস্তিরা মিছিল করে বের হয় রাস্তায়। তারা সুন্নী। তাদের পরনে বিশেষ ধরনের পোশাক-সবুজ লুঙ্গী, সবুজ শার্ট, মাথায় পাগড়ী, গলায় 'কাফনী' (কাফনের কাপড়), কবজীতে ও গলায় সোনালী তাগা। এক হাতে তাদের পানির গ্লাস, সঙ্গে পানির পাত্র, অন্য হাতে চিত্রিত লাঠি, পা খালি।

ষষ্ঠ দিন ভিস্তিরা হোসেনী দালানে গিয়ে তাদের লাঠিগুলো মাঠে কাঁচির মতো রেখে দেয়। লাঠির নীচে জ্বলে মোমবাতি এবং তারপর হাজার হাজার মানুষকে বিলানো হয় নিয়াজ।

সপ্তম দিন হচ্ছে 'জুলুস' (মিছিল)। ঐ দিন হোসেনী দালান সাজানো হয় আলো দিয়ে। অষ্টম দিন আশেপাশের গ্রাম থেকে মহিলারা আসেন জারি গাইতে। অপরাহ্নে এ জারি গাওয়া হয় দেখে এর নাম 'দুপহরিয়া মাতম।' এ সময় পুরুষরা ত্যাগ করে হোসেনী দালান। বিকেলে হোসেনী দালান থেকে বের হয় বিশাল মিছিল যার নাম 'তুগ-গাস্ত' (তুর্কী শব্দ তুগ মানে পতাকা; গাস্ত মানে ঘুরে বেড়ানো)। বকশীবাজার, উর্দু রোড, বেগম বাজার, দেওয়ান বাজার হয়ে তা এসে পৌছে চকে। মিছিলের প্রথমে থাকে কয়েকটি আখড়া (অর্থাৎ আখড়ার সদস্য), তারপর আলম বরদার (পতাকাবাহী)। এরপর নিশান নিয়ে হাতি। হাতির পর ঘোড়া। ঘোড়ার সঙ্গে থাকে আশা বরদার (লাঠিয়াল), তারপর গানের দল। প্রথমে মহল্লার কোন দল যারা শোকের সুর বাজায়, এরপর ঘোড়ার পিঠে 'নহবৎ,' তারপর বাদকদল, সবশেষে একটি ডংকা। ডংকার পর জোড়া জোড়া 'কিবি কা দোলা।' পালকিগুলো মোড়া থাকে কালো কাপড়ে। পালকির সঙ্গে পয়সা বিলোবার জন্য থাকে লোক। দোলার দু'দিকে সরদারদের নেতৃত্বের মাঝে মাঝে শ্লোগান দিতে দিতে যায় ভিস্তিরা। আগে দোলাগুলি নেয়া হ'ত উটের পিঠে করে। দোলা যখনই যায় তখনই দু'ধারের লোক দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। দোলার পর 'দুলদুল'কে নিয়ে কালো অথবা সবুজ পোশাক পরা শোকাহত জনতার মিছিল। সবশেষে থাকে একটি হাতি ও দু'জন ঢোল বাদক।

নবম দিনে অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেলে। ঐ দিন বিবিকি রওজা থেকে বের হয় মিছিল। রাত এগারোটায় চক হয়ে ওঠে জনাকীর্ণ, বিভিন্ন আখড়ার কলাকৌশল দেখতে। আখড়ার মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত তিনটায়। আবার 'তুগ গাস্ত' এর মতো মিছিল করে সবাই ফিরে যায় হোসেনী দালানে।

আশুরার দিন আজিমপুরে বসে বিরাট মেলা, তা এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। বিভিন্ন ইমামবাড়া থেকে ঐ দিন তাজিয়া নিয়ে মিছিল করে সবাই আসে আজিমপুরের হুসেনাবাদে। সেখানে তাজিয়াগুলি বিসর্জন দেয়া হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রতীক

কবরগুলো কালো কাপড়ে ঢেকে নিঃশব্দে নিয়ে আসা হয় হোসেনী দালানে।'[২৬] এভাবেই মুহররম পর্ব শেষ হয়।

কবি শামসুর রাহমান ছোটদের জন্য লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে মুহররম ও মুহররম মিছিলের দীর্ঘ বর্ণনা দিতে ভোলেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন চল্লিশের দশকের মুহররম মিছিলের কথা- "মুহররমের মিছিল সবচেয়ে ভালো লাগতো চকে। মাঝরাতের মিছিল। নানীর সঙ্গে যেতাম চকবাজারের একটা বাড়িতে রাত্তিরে মিছিল দেখবো বলে। নানী বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন আর আমি মিছিলের জন্যে অপেক্ষা করে ঝিমুতাম। কখন ঘুম পাড়ানী মাসিপিসী তাদের রূপালী সোনালী পাখা দুলিয়ে সবচেয়ে মিষ্টি এক সুরে গান গাইতে গাইতে হাজির হতেন চকের সেই বাড়িটার আঁধার ভরা বারান্দায়, টের পেতাম না ..... একটু পরেই চোখের সামনে ঝলমলে মিছিল। আলম বরদার, আশা বরদার, কালো কাপড়ে ঢাকা বিবিকা দোলা- একে একে সবকিছু চোখের সামনে। আমার চোখ লুট করতে শুরু করে সিল্কের নিশান, লাঠির ঠোকাঠুকি, তলোয়ারের ঝলসানি, আগুনের চরকি। ফাঁকে ফাঁকে শোনা যায় ভেস্তাদের 'এক নারা, দোনারা, বোলো বোলো ভে-স্তা।'

চোখ জুড়িয়ে যেত লাঠি ঘোরানোর কায়দা দেখে, আগুনের চরকির খেলা দেখে। মনে হতো, যদি আমিও ফুরফুরে বাতাসে দু'লে ওঠা ঐ সুন্দর সিল্কের রঙ্গিন নিশান নিয়ে ভেস্তাদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে পারতাম। লোভে নতুন পয়সার মতো চকচকিয়ে উঠতো আমার চোখ দুটো। ঐতো চলছে কাগজের কবর। আর চলেছে দুলদুল ঘোড়া। দেখি ওর তীর বেঁধা গায়ে একটা চাদর, চাদরে নকল রক্তের ছোপ। আর দেখি সিল্কের রঙ্গিন নিশানের ঝাঁক। ঝিলমিল, ঝিলমিল। নীল, লাল, সবুজ, হলদে হরেক রকম। দেখি ভেস্তার দল। পরনে টিয়ের ডানার রঙের মতো সবুজ লুঙ্গি, সবুজ কুর্তা। খালি পা। হাতে রূপালী তারের কাঁকনের মতো কী যেন একটা। দূর থেকে মনে হয়, তারা জ্বলছে ওদের কব্জিতে। আর শুনি ভেস্তার দল বলছে, 'এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে-স্তা।"[২৭]

মুহররমে ঢাকার ভিস্তিদের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে গেছেন ঢাকার পঞ্চায়েতের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক খান মোহাম্মদ আজম। তিনি বর্ণনা করছেন, মুহররমের সময় ঢাকার অনেক হিন্দু ও মুসলমান [সুন্নী ও অন্যান্য সম্প্রদায়] ভিস্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এবং প্রাচীনকাল থেকেই মুহররমের দশদিন ভিস্তিরা নিজেদের সাময়িক পঞ্চায়েত গঠন করে। তখন এর প্রধান সর্দারকে বলা হয় নওয়াব ভেস্তা।[২৮]

সম্প্রতি বাংলা একাডেমীর ফোকলোর বিভাগের কর্মীরা ঢাকার মুহররম পালন সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি বিবরণ তৈরি করেছেন। এর সময়কাল এ শতকের ত্রিশের দশক। পূর্বে উল্লিখিত হাকিম আহসানের বিবরণের সঙ্গে দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া এ বিবরণের তেমন কোনো তফাৎ নেই। বাংলা একাডেমীর বিবরণে যে নতুন তথ্যগুলি পাই সেগুলো তুলে ধরছি— "হোসেনী দালানের সামনের চত্বরে পাঁচই মুহররম থেকে নয়ই মুহররম পর্যন্ত প্রতি রাতেই অনুষ্ঠিত হতো মাড়োয়া সম্প্রদায়ের বাঁশের কাড়ি পিটান নাচ-এর মাতম। আর দক্ষিণ দিকের পুকুরের পাশে হতো মহল্লার কবিয়ালদের ভাটিয়াল জারীগানের প্রতিযোগিতা। ভাটিয়াল জারী বা শোকজারী শোকানুষ্ঠান হলেও শেষ পর্যায়ে মহল্লায় মহল্লায় এ প্রতিযোগিতা অনেকটা কবিগানের মতো হয়ে যেতো। দক্ষিণের পুকুরটির মাঝে পাঁচটি পিলার দিয়ে সে পিলারের উপর প্রতিরাতেই অসংখ্য মোম জ্বলিয়ে দেয়া হতো।

..... হোসেনী দালানের সামনের চত্বরে এগারো ও বারোই মুহররম সম্মিলিত অসংখ্য মহিলারা মর্সিয়া ও মাতমখানি করতেন। এ সময়ে হোসেনী দালান চত্বরে পুরুষদের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অপর দিকে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অচ্ছুত সম্প্রদায়ের লোকজন মুহররম উপলক্ষে কাঠ, বাঁশ ও রঙ্গিন কাগজে সজ্জিত বিরাট বিরাট তাজিয়া বহন করে হোসেনী দালানে এসে উৎসর্গ করে যেতো।"[২৯]

বর্তমানে ঢাকা শহরে, হুসেনী দালান ও বিভিন্ন মহল্লার [পনেরটি] ইমামবাড়ায় সেই প্রথামত মুহররম পালিত হয়। তবে, রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠানের সামান্য কিছু পরিবর্তন এসেছে মাত্র। কিছু আচার-অনুষ্ঠান লুপ্ত হয়েছে, আর ১৯৪৭-এর শিয়া মুহাজেরদের কারণে, নতুন কিছু সংযোজিত হয়েছে। তবে, মুহররমে দশ দিনের মূল আচার-অনুষ্ঠানে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ঢাকার মুহররম অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল মিছিল ও মেলা। মিছিল অনুষ্ঠানের চল নির্দিষ্ট করে কবে থেকে তা জানা যায়নি। তবে, অনুমান করে নিতে পারি, মুঘল আমলে, অষ্টাদশ শতকে এটি শুরু হয়েছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত জানিয়েছেন, মুহররম ছিল ঢাকার দ্বিতীয় ব্যাপক উৎসব।[৩০] কামরুদ্দীন আহমদের আত্মজীবনী থেকে ত্রিশদশকের ঢাকার মিছিল সম্পর্কে খানিকটা জানা যায়।

"মহরমের মিছিলে থাকতো সাজানো তাজিয়া, দুলদুল ঘোড়া আর নানা রঙের হাজারো নিশান। 'হায় হাসান', 'হায় হুসেন' ধ্বনি আর তাজিয়ার উপর থাকত হাজার জালালী কবুতর। কিন্তু জন্মাষ্টমীর মিছিল যেমন হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ সকলেরই কাছে প্রিয় ছিল মহরমের মিছিল তেমনটি ছিল না। মহরমের মিছিলের

অগ্রভাবে চলত লাঠি ঘোরানো, তলোয়ার খেলা আর পিছনে চলত জ্বলন্ত ইটের মিছিল। যদিও সে যুগে ঢাকায় শিয়া মুসলমান এক রকম ছিল না বললেই চলে তবু যথেষ্ট মুসলমানের সমাগম হ'ত ঢাকার ঐ মিছিল দেখার জন্য। মুসলমানেরা ঐ মিছিল বের করত শান-শওকতের সাথে যতটা, ততটা নয় ধর্মের টানে। আসল কারণ বোধহয় নিজেদের জন্মাষ্টমীর মিছিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।"[৩১]

ষাটের দশক পর্যন্ত মুহররম মিছিলে জাঁকজমক ছিল, ক্রমে তা পুরনো মূল মিছিলের কংকালে রূপ নেয়। এখন মূল যে মিছিল বের হয়, তা সকালে শুরু হয় হুসেনী দালান থেকে। সেখান থেকে বকশীবাজার, আজিমপুর, পুরানা পল্টন হয়ে বিকেলে ধানমন্ডির ঝিলে গিয়ে শেষ হয়। তাজিয়া বিসর্জন করা হয় ঝিলে। আগে করা হ'ত আজিমপুরের কারবালার ঝিলে [পুরানা পল্টন লাইনের কাছে, এখন সে ঝিল আর নেই]। ঢাকার মুহররমে একটি প্রধান আকর্ষণ মেলা। মুহররম উপলক্ষে মেলা বসে হোসেনী দালান,বকশীবাজার, ফরাসগঞ্জ ও আজিমপুরে। এর মধ্যে আজিমপুরের মেলাটিই সবচেয়ে বড়। এ ছাড়া বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলেই মুহররম পালিত হোক না কেন, এর আনুষঙ্গিক উপাদান হিসেবে মেলা থাকবেই।

সবশেষে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুহররম পালন সম্পর্কে দু'একটি কথা। এসব তথ্য সাম্প্রতিককালের এবং তা বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত। তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে মানিকগঞ্জ, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলার প্রত্যন্ত গ্রামসমূহ থেকে। এবং দেখা যাচ্ছে, এসব অঞ্চলে মুহররম পালনের পদ্ধতি শহর বা মফস্বল শহর থেকে ভিন্ন।

"এসব অনুষ্ঠানগুলো কোন কোন এলাকায় নির্ধারিত বাড়িতে বংশ-পরম্পরায় বিভিন্ন লৌকিক পীর ফকিরের অনুষ্ঠান ও শিরনি মানত ইত্যাদি নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী উদযাপিত হয়ে থাকে। উল্লিখিত বাড়িগুলোতে মুহররম মাসের প্রথম তারিখেই বাড়ির প্রাঙ্গণ বা বাড়ি সংলগ্ন একটি স্থানে এটেল মাটি এনে তিনতাক বিশিষ্ট চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি বেদী তৈরি করা হয়। বেদীটির সামনেই খনন করা হয় ছোট একটি পুকুর। এবার পুকুর ও বেদীটি লেপে পুছে বেদীর চারকোণায় চারটি চার রঙ্গের পতাকা গেঁথে এর মাঝে মাঝে কাঁচা মাটির ওপর পিতল বা রূপার তৈরি ছোট ছোট চাঁদ, তারা, চোখ ইত্যাদি লাগানো হয় এবং সামনের পুকুরটি সাধ্যানুযায়ী দুধ বা পানিতে পূর্ণ করার পর বেদীর একপাশে একটি ধারালো ছুরি বা তীর বিদ্ধ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ এ বেদীটিকে বলা হয় 'বরকত মা'র থল'। থলটির চারপাশে রঙ্গিন কাগজের ঝালর ও ছোট ছোট নিশান পুতে এর একটি সীমানা নির্ধারণ করা হয়।"[৩২] এটিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় অনুষ্ঠান। এখানেই সবাই এসে

মানত করে, জিনিসপত্র দিয়ে যায়। আর যিনি 'থল' পরিচালনা করেন তিনি দশ দিন শুধু নিরামিষ খেয়ে রোজা রাখেন। এ ছাড়া, মুহররমের বাকী অনুষ্ঠান যেমন, মার্সিয়া, জারী গাওয়া, লাঠি খেলা সব অন্যান্য অঞ্চলের মতোই। তবে এসব গ্রামে মুহররমের সব অনুষ্ঠানের কেন্দ্রই 'থল' এবং দশই মুহররম মাটির বেদীটিকেই বিসর্জন দেওয়া হয়। মুহররমের সূত্রপাত মেসোপটেমিয়ায়, ছড়িয়ে পড়েছিল তা পরে ইরান, লেবানন, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। সূত্রপাতের সময় এর আচার অনুষ্ঠানে ছাপ ফেলেছিল, এ্যাডোনিস-তামুজের উৎসব, বিভিন্ন লোক ও কাল্টে বিশ্বাস।

বাংলাদেশে বহিরাগত শাসক শিয়া-প্রবর্তিত মুহররমের আদি রূপ কি ছিল, তা আমাদের জানা নেই। কারণ, সে সম্পর্কে তথ্য প্রায় নেই। কিন্তু উনিশ শতকের মুহররম পালনের যে বর্ণনা পাই বা অতি সাম্প্রতিককালের বর্ণনা থেকেও এটা স্পষ্ট যে, যে রূপেই মুহররম এতদঞ্চলে প্রচলিত হয়ে থাকুক না কেন, সে রূপ আর থাকে নি। মধ্যপ্রাচ্যে যেমন কাল্ট, বিশ্বাস মুহররমের আচার-অনুষ্ঠান প্রভাবিত করেছে তেমনি বাংলাদেশে লোকায়ত আচার বিধি, বিশ্বাস, মুহররমের আদিরূপ বদলে দিয়েছে আত্মীকরণের মাধ্যমে।

আগেই উল্লেখ করেছি, শুদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে দেখলে, সুন্নী মুসলমানের পক্ষে মুহররমে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এর কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান পৌত্তলিকতার সামিল। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের কথা দূরে থাকুক, মৌলবাদীদেরও এ উৎসবে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে দেখিনি। খুব সম্ভব, এ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যেহেতু হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর দৌহিত্রদের নাম জড়িত, সেহেতু সুন্নীরাও ভাবপ্রবণ হয়ে থাকেন [যদিও শুদ্ধ ইসলামে এ ধরনের ভাবপ্রবণতার অবকাশ আছে কিনা জানি না]। গত দেড়শো দুশো বছর ধরে মুহররম পালিত হয়ে আসছে। এ সময়ে ইসলাম শুদ্ধিকরণের আন্দোলন বাংলাদেশে কম হয়নি। কিন্তু মুহররমের আচার-অনুষ্ঠানের কেউ বিরোধীতা করেছেন বলে শুনিনি। এর কারণ কি? তা পরে উল্লেখ করছি।

মুসলমানদের কথা না হয় বাদ দিলাম। হিন্দু বা অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন কেন যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে এবং পালন করেন এর অনেক আচার বিধি? গত শতকে জেমস ওয়াইজ লিখে গেছেন, হিন্দু জমিদাররা যেমন মুহররম পালনে অর্থ সাহায্য করে থাকেন, মুসলমান জমিদাররাও তেমনি অর্থ সাহায্য করেন দুর্গা পূজায়।[৩৩]

১৮৩১ সালের এক প্রবন্ধে জানা যায়, হিন্দুরা তাজিয়া দেখলে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানাতেন। বাংলায়, বছরে ১৪ হাজার তাজিয়া নির্মিত ও প্রদর্শিত হয়, তার মধ্যে ৬০০টিই হিন্দুদের তৈরি।[৩৪]

আসলে, তৃণমূল পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে বাঙ্গালী কখনো, অন্তত উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তেমন মাথা ঘামায়নি। ধর্মীয় উৎসব আক্ষরিক অর্থে ধর্মীয় উৎসব ছিল না, ছিল এক ধরনের আনন্দোৎসব বা মিলনোৎসব। যে কারণে, দুর্গা পূজায় মুসলমানদের ভীড় কম হ'ত না। তবে, হিন্দু নিম্নবর্ণের নর-নারীর নিকটও এর জনপ্রিয়তার কারণ, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এ্যানিমিজম বা সর্বপ্রাণবাদ এবং ফেটিসিজম বা জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যা এদের বিশ্বাস ও সংস্কারের অন্তর্গত। বস্তুত মুহররম অনুষ্ঠানে এগুলোই ধীরে ধীরে যুক্ত হয়। লোকজ ও স্থানীয় আচার যুক্ত হওয়ায় সকল শ্রেণীর হিন্দু নর-নারীর এতে অংশগ্রহণ করতে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তাই বাধা আসেনি।[৩৫]

বাংলাদেশের অনেক সুন্নী মুসলমানরাও তো ধর্মান্তরিত। এদের চেতনায় পূর্বপুরুষদের সেই পূর্ব সংস্কার প্রবাহিত হচ্ছে না এমন কথা বলা যাবে না। এ কারণেই, মুহররমের অনেক পৌত্তলিক আচার-আচরণ মেনে নেয়া হয়েছে। এবং এখনও সেই চেতনা বহমান যে কারণে, বাংলাদেশের শিক্ষিত এমন কি বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা এমন অনেক কিছুতে বিশ্বাস করেন, যা যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়, [যেমন, কোরবানীর মাংস, মুহররমে খেলে পুণ্য হয়। একারণে অনেকে মুহররম পর্যন্ত কোরবানীর মাংস জমিয়ে রাখেন]।

স্থানীয় বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে, অনেক অঞ্চলে, মুহররম অনুষ্ঠানের কিছু আচার বিধিতে হয়ত পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু উৎসবের মূল কাঠামো মোটামুটি একই আছে, যেমন-দশদিনের অনুষ্ঠান, ইমামবাড়াকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান, রোজা রাখা, মার্সিয়া বা জারী গাওয়া, তাজিয়া তাবুত নির্মাণ ও বিসর্জন, মিছিলে 'দুলদুল', মানত, মিছিলও মেলা।

পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম, প্রচলিত আচার বিধি কিভাবে বাংলাদেশের মুহররমকে প্রভাবিত করেছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে, গত শতকে জেমস ওয়াইজ খানিকটা আলোকপাত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, মুহররম পালনের দশ দিনের প্রস্তুতির সঙ্গে মিল আছে দুর্গা পূজার প্রস্তুতির। তাজিয়া তাবুত নির্মাণের সঙ্গে মিল আছে রথ-নির্মাণ এবং রথ টেনে নেওয়ার। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে ওয়াইজ ঢাকার একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। আগে, ওয়াইজের মতে, জনৈক নীলবাহার বিবি ফাতেমার সম্মানে একটি সেনোটাফ নির্মাণ করেছিলেন। এবং কয়েক জেনারেশন ধরে বহু হায়দরী নামে একটি কাগজের তাজিয়া রাখা হ'ত মুহররমের সময়। আশুরার তারিখে সবচেয়ে বৃদ্ধ এবং সম্মানীয় ব্যক্তিটি সেখানে রাত্রি যাপন করতেন। এক পরি তাঁকে জানাতো কখন তাজিয়াটি সরাতে হবে। ঐ নির্দেশিত

সময়ে তাজিয়াটি বের করে একটি প্ল্যাটফর্মে বা 'গদী নীল বাহারে' রাখা হয় এবং ভক্তরা তখন হুড়োহুড়ি করতে থাকে তাজিয়াটি বহন করার জন্য। একবার চলা শুরু হলে বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত তাজিয়া কোথাও নামানো যাবে না।[৩৬]

মানত করা বা গ্রাম-বাংলায় দেবতার থানে ভোগ দেওয়া প্রাচীন এক বিশ্বাস। আমরা যে সব অঞ্চলের অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছি তার সব কটিতেই দেখা যাচ্ছে জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই মানত করছেন। ঢাকাতে নুসরাত জঙ্গ-এর কবরে শিরনী দিয়ে মানত করা হ'ত। অষ্টগ্রামে দেখা যাচ্ছে, 'দুলদুল' রূপী ঘোড়াকে কেউ স্পর্শ করে না, যেমন হিন্দুরা করে না ধর্মের ষাঁড়কে।

ঢাকাতে জুলজানার পা ধোওয়ানোর ব্যাপারটি ধরা যাক-"লক্ষ্য পুরণের আশায় মুহররম মাসের আশুরাতে তাজিয়া মিছিল চলাকালে মহিলারা অগ্রগামী ঘোড়া, জুলজানার সামনের পা দুটি একপাত্র দুধ দিয়ে ধুয়ে দেন এবং জুলজানাকে হালুয়া জাতীয় কিছু খাবার দিয়ে পা ধোয়ানোর পর মানতকারী মহিলা নিজের মাথার চুল দিয়ে সে ঘোড়ার পা মুছে দেয়। পা ধোওয়ানোর পর যে দুধটুকু থাকে তা বাসায় নিয়ে নারীর সন্তান ধারণ ও কঠিন রোগ ব্যাধিতে এ দুধ পান করান।"[৩৭] প্রত্যন্ত গ্রামে 'বরকতের থল'- এর সঙ্গে আদিম রীতিনীতির তেমন কোন তফাৎ নেই। মুহররম অনুষ্ঠানের সূচনায় ডংকা বাজানো এবং দুর্গা পূজার সূচনায় ঢাকে কাঠি দেওয়ার ও তেমন কোন অমিল নেই। মোমবাতি দিয়ে ইমামবাড়া সাজানোর মূলে হয়ত আছে দেওয়ালি উৎসব। শুধু তাই নয়, "হিন্দুদিগের চৈত্রোৎসব নিকটবর্ত্তী হইলে অনেক সামান্য লোক যেমন ভজন শিক্ষা করিয়া থাকে, অত্রত্য [ঢাকার] মুসলমানরাও তেমন মহরমের সময় নিকটবর্তী হইলে 'ইয়া হোসেন' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে অভ্যাস করে।" মুহররমের দিন শুধু শিয়ারা নয়, দেখা যাচ্ছে হিন্দুরাও অনেকে উপবাস করতেন। ঢাকার কায়েতটুলীর হিন্দুদের উপবাসের কথা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। কায়েতটুলীতে এক সময় বসবাস করতেন মুগল দরবারে কর্মরত করণিকরা। তাঁদের ওপরওলারা ছিলেন হয়ত শিয়া। তা থেকেও উপবাসের ব্যাপারটি আসতে পারে।

ঢাকার মুহররমের প্রধান আকর্ষণ ছিল মিছিল, যার শুরু খুব সম্ভব নায়েব নাজিমদের সময় থেকে। নায়েব-নাজিমরা কেন মিছিল শুরু করেছিলেন? তাঁরা ছিলেন শিয়া। সে ধর্মবোধ নিশ্চয় কাজ করেছিল তাঁদের মধ্যে। এ ধরনের মিছিল ঈদের সময় বের হ'ত দিল্লীতে, মুঘল সম্রাটদের আমলে। নিজেদের জাঁকজমক, প্রভাব প্রতিপত্তি, আধিপত্য দেখাবার অন্যতম মাধ্যমও ছিল এই মিছিল। কালক্রমে এ মিছিলে যুক্ত হয়েছিল স্থানীয় উপাদান। ফলে, ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের মতো

এটিও এক ধরনের সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল। সেই কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন বিনাদ্বিধায় অংশ নিতেন মুহররম মিছিল বা অনুষ্ঠানে।

ঢাকার মিছিলের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ভিস্তিদের যোগদান। ভিস্তিরা ছিলেন এক সময় ঢাকার নগর জীবনের অতি আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান। পানির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, কারবারের সম্পর্কও পানির সঙ্গে। তাই সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই এসেছেন তাঁরা মিছিলে।

মুহররম অনুষ্ঠানের একটি প্রধান উপাদান মর্সিয়া বা ভাটিয়ালী জারী গাওয়া। এই গান গাওয়ার একটি কারণ "লোকসমাজ সঙ্গীতপ্রিয়। কি হিন্দু কি মুসলিম এর ভেতর দিয়েই তাদের সংস্কৃতি পিপাসা নিবারণ করে। মুহররম উপলক্ষে মর্সিয়া ও জারী গান তাই সাধারণ মানুষকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে।"[৩৮] তা'ছাড়া ভাটিয়ালী সুরে জারী গান একেবারে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। আর তেমনি মেলাও যা এখন মুহররম অনুষ্ঠানের একটি প্রধান আকর্ষণ।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বাহারউদ্দিন, 'ইসলামি পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব,' *দেশ*, কলকাতা, ৫.৯.১৯৮৭, পৃ. ৪৯-৫৬
২. Ivar Lassy, *The Muharram Mysteries among the Azerbeizan Turks of Caucasia*, Helsinglors, 1916. P. 284.
৩. G.E.Van Grunebaum, *Muhammadan Festivals*, London, 1957.
৪. বাহারউদ্দিন, পূর্বোক্ত
৫. Ivar Lassy, *op cit*. PP 244, 278.
৬. Grunebaum, *op. cit*.
৭. Zakiuddin Ahmad, *Life and Conditions of the People of Bengal, 1765-1785*, (Unpublished Thesis, 1965: New College, Oxford).
৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, এম, এ, রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* [মোঃ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত], দুই খন্ড, ঢাকা ১৯৮২
৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *হাকিম হাবিবুর রহমান*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২১-২২
১০. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal*, London, 1885. P.9.
১১. ঐ
১২ বিপিনচন্দ্র পাল, *আমার জীবন ও সমকাল* [শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত], ১ম পর্ব, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৫১
১৩. ঐ

১৪. ঐ,
১৫. ঐ, আরো দেখুন, S C Dey, *Sylhet*, Calcutta, 1880.
Robert Lindsay, Anecdotes of an Indian life in Oriental Miscellanies, Wigan, 1840
১৬. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *আমাদের কালের কথা*, চট্টগ্রাম, ১৩৭৫, পৃ. ৯২-৯৩
১৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৬৯
১৮. অষ্টগ্রাম ও মানিকগঞ্জের মুহররম পালনের সম্পূর্ণ তথ্য নেওয়া হয়েছে *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন ঃ ৪৯*, সম্পাদনাঃ মোঃ সাঈদুর। ঢাকা ১৯৮৮ থেকে। মুহররম সম্পর্কে ইতোপূর্বে এ ধরনের কোন বিস্তৃত তথ্য আগে করা হয়নি
১৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রঃ-AH. Dani, *Dacca*, Dacca, 1957
২০. Azimusshan Haider, *Dacca*; (History and ramane in Place Names, Dacca,1969.)
২২. দ্রঃ- জেমস টেলর, 'কোম্পানী আমলে ঢাকা' [মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত], ঢাকা
২৩. S.M. Taifoor, *Glimpses of old Dhaka*, Dacca. 19. P.125.
২৪. *সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়*, কলকাতা, ১৮৫০
২৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ঢাকা, ১৮৬৪
২৬. দানীর পূর্বোক্তগ্রন্থ
২৭. বিস্তারিত বিবররণের জন্য দেখুন, শামসুর রাহমান, *স্মৃতির শহর*, চট্টগ্রাম, ১৩৮৬, পৃ. ৩৪-৪৩
২৮. K.M.Azam, *The Panchayat System*, Dacca, Dacca, p 27-28.
২৯. *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলনঃ ৪৯*, পৃ. ৯০
৩০. ভবতোষ দত্ত, *আট দশক*, কলকাতা, ১৯৮৭
৩১. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ঢাকা ১৩৮২ পৃ. ৩৯
৩২. *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন* পৃ. ১০০-১০১
৩৩. জেমস ওয়াইজ, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৯
৩৪. Asiatic Journol, vol vi, 1831. P 359. Quoted in Zakiuddin, *opcit*.
৩৫. মোমেন চৌধুরী, 'মুহররম পর্বে লৌকিক ধারা', *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলনঃ ৪৯*, পৃ. ১২৩
৩৬. জেমস ওয়াইজ, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৯
৩৭. *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন*, পৃ. ৮৭.
৩৮. ঐ, পৃ. ১২৩

জন্মাষ্টমী

সে উৎসব এখন স্মৃতি। অথচ, এক সময় এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে ঢাকাবাসীরা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন জন্মাষ্টমী বা জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য। বলা যেতে পারে, জন্মাষ্টমী পালন এ অঞ্চলের একটি প্রাচীন উৎসব, বিশেষ করে ঢাকা শহরের, যে উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন হিন্দু মুসলমান সবাই। শুধু তাই নয়, জন্মাষ্টমীর সময় ঢাকা শহরে যে মিছিল বেরুত তা বিখ্যাত ছিল সারা বাংলায়।

শ্রাবণ বা ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই তিথিতে। তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এই মাস পবিত্র। জন্মাষ্টমী পালনের ফল সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখছেন– "জন্মাষ্টমী ব্রতের ফল– ভবিষ্যের মতে, ঐ দিনে কেবলমাত্র উপবাসেও সপ্ত-জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। মন্বন্তর প্রভৃতি পুণ্যদিবসে স্নান-পূজাদি করিলে যে ফল জন্মে, জন্মাষ্টমী দিনে তাহার কোটি গুণ ফল জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে– ঐদিনে কেবল তর্পণ করিলেও শতবর্ষব্যাপী গয়াশ্রাদ্ধের ন্যায় পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। স্কন্দ পুরাণের মতে জন্মাষ্টমী ব্রত স্ত্রী পুরুষ সাধারণেই প্রতি বৎসর কর্তব্য। এই ব্রত করিলে সন্তান, সৌভাগ্য, আরোগ্য, অতুল আনন্দ এবং ধার্মিকতা প্রভৃতি ইহকালে লাভ করিয়া পরকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।"[১]

উপমহাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কোন না কোন ভাবে এ তিথি উদযাপিত হয় ধর্মীয় উৎসব হিসেবে। বাংলায় "উৎসব ছাড়া উপবাস ও রাত্রিতে কৃষ্ণের সাড়ম্বর পূজার ব্যবস্থা আছে। কোথাও মৃন্ময় মূর্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী প্রদর্শন করা হয়।"[২]

বাংলাদেশে জন্মাষ্টমী কিভাবে পালিত হ'ত তার বিশদ বর্ণনা আমার চোখে পড়েনি। তবে, অনেকেই ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের উল্লেখ করেছেন। এতে মনে হয়, বিভিন্ন জায়গায় জন্মাষ্টমী অন্যান্য ধর্মীয় তিথির মতো সাধারণভাবে পালিত হলেও ঢাকায় বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ত। মিছিল ছিল সে অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ, এবং তাই ঘুরে ফিরে বিভিন্ন বর্ণনা বা স্মৃতিকথায় মিছিলের কথাই

এসেছে। এখানে তাই, জন্মাষ্টমী পালনের বর্ণনা ঢাকা শহরের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে।

জন্মাষ্টমী পালনের প্রধান অঙ্গ ছিল এর মিছিল এবং এ মিছিলের বর্ণাঢ্য বিবরণ ছড়িয়ে আছে সংবাদপত্রে, বিভিন্ন স্মৃতিকথায়। কিন্তু কবে থেকে এবং কেন এ মিছিলের শুরু তার ইতিহাস জানা যায়নি। মিছিলের ইতিহাস জানা যায় মাত্র একটি পুস্তিকা থেকে [এ প্রসঙ্গে আমি আর কোন সূত্রের সন্ধান পাইনি]। ঢাকা থেকে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত এ পুস্তিকাটি লিখেছিলেন শ্রী ভুবনমোহন বসাক। সম্ভবত নবাবপুরের বসাক পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। তাই মিছিল সম্পর্কে কিছু তথ্য তিনি দিতে পেরেছিলেন। লেখক বয়োবৃদ্ধ ঢাকাবাসীদের স্মৃতি অবলম্বন করে পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন। তাঁর তথ্য অনুযায়ী ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসার আগে [অর্থাৎ ১৬১০ সালের পূর্বে] বংশালের কাছে, পিরু মুনশীর পুকুরের পাশে বাস করতেন এক সাধু। ১৫৫৫ সালে [ভাদ্র, ৯৬২ বাংলা সন] তিনি 'শ্রীশ্রী রাধাষ্টমীর' উপলক্ষে বালক ও ভক্তদের হলুদ পোশাক পরিয়ে এক মিছিল বের করেছিলেন। এর দশ বারো বছর পর সেই সাধু ও বালকদের উৎসাহে 'রাধাষ্টমীর কীর্তনের পরিবর্তে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে জন্মাষ্টমীর নন্দোৎসবের সময় অপেক্ষকৃত জাঁকজমকের সহিত একটি মিছিল' বের করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। প্রথম জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হয়েছিল ১৫৬৫ সালে [ভাদ্র মাসে]। পরে মিছিলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার অর্পিত হয়েছিল নবাবপুরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কৃষ্ণদাস বসাকের পরিবারের ওপর।[৩]

কালক্রমে সেই মিছিল একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এবং প্রতি বছর জন্মাষ্টমী উৎসবের নিয়মিত অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। যতীন্দ্রমোহন উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণদাস মুৎসুদ্দিই ঢাকায় প্রথম এ মিছিলের প্রবর্তন করেছিলেন।[৪] ধারণাটি বোধহয় ঠিক নয়। কৃষ্ণদাস বসাক যেহেতু ধনাঢ্য ছিলেন, তাই কালক্রমে তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল মিছিলের দায়িত্ব। এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এ উৎসবের তিনি সূচনা করেছিলেন। মুসলমানরা এই মিছিলের নামকরণ করেছিলেন 'বাল গোপালের মিছিল' বলে।

কৃষ্ণদাস বসাকের সময় থেকে কিভাবে জন্মাষ্টমীর মিছিল কালক্রমে বিশাল উৎসবে পরিণত হয়েছিল তার ধারাবাহিক খানিকটা ইতিহাস জানা যায় যতীন্দ্রমোহনের লেখায়– "অনুমান ১০২০ [১৬১৩] বঙ্গাব্দের পর ব্রজলীলার সং লইয়া মিছিলের উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ হয়। নন্দোৎসব প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা সম্পর্কীয় সং ব্যতীত অন্য কিছু জন্মাষ্টমীর অঙ্গভুক্ত করিবার আবশ্যকতা তখনও উপলব্ধি হয়

নাই। তৎকালে কৃষ্ণ বলরামসহ নন্দ যশোদাদি একটা কাষ্ঠ নির্ম্মিত মঞ্চ মধ্যে স্থাপিত করিয়া বাহির করা হইত। তৎসঙ্গে নধি নবনী প্রভৃতি ভারবাহী ও অন্যান্য নর্ত্তন পর গোপ ও ব্রজবাসিগণ কেহ কেহ অম্বোপরি ও কেহবা ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া নৃত্য ও বাদ্যাদি করিয়া চলিত। ইহাই প্রথমাঙ্গ নন্দোৎসব বটে। সেই সঙ্গে ভক্তিমান পরম বৈষ্ণব বসুক বৃদ্ধাগণ পীত বস্ত্র পরিহিত ও পুষ্প মাল্যাদি ভূষিত হইয়া খোল করতালযোগে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উহার প্রত্যুদ্গমন করিত। অনন্তর কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হইলে ১০৪৫ বঙ্গাব্দের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিপাদ সমন্বিত চৌকিতে ভগবানের অবতারাদির মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে ক্রমশঃ পতাকা নিশানাদি ও বন্দুক বর্ষা [বর্শা] প্রভৃতি এবং আশাটা বল্লম ছড়ি ধারী পদাতিক ও অন্যান্য সাজসজ্জাসহ মিশিলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই মিশিলের পরবর্তী উন্নতাবস্থা।'[৫]

এরপর নবাবপুরের অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজ নিজ মিছিল বের করা শুরু করেছিলেন। প্রায় একশো বছর অতিক্রান্ত হলে, উর্দু বাজারের গঙ্গারাম ঠাকুর নামে জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণও নবাবপুরের বসাকদের অনুকরণে শুরু করেছিলেন জন্মাষ্টমীর মিছিল। তাঁর মিছিল আসত উর্দু রোড থেকে নবাবপুর পর্যন্ত। অন্যান্য মিছিলও সাধারণত নবাবপুর, বা নবাবপুর থেকে বাংলা বাজার হয়ে নবাবপুরেই প্রত্যাবর্তন করত।

তবে, গঙ্গারাম ঠাকুরের মিছিল বেশি দিন চলেনি। কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবং মনে হয় কালক্রমে নবাবপুরের বিভিন্ন মিছিল সমন্বিত করে একটি মিছিলে রূপ দেওয়া হয়েছিল, যা পরিচিত হয়ে ওঠে নবাবপুরের মিছিল নামে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পান্নিটোলার গদাধর ও বলাইচাঁদ বসাক ছিলেন ধনে মানে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। খুব সম্ভবত নবাবপুরের মিছিল দেখে তাদেরও বাসনা হয়েছিল নিজ এলাকা [ইসলামপুর] থেকে একটি মিছিল বের করার। সেই ইচ্ছানুযায়ী ১৭২৫ সালের দিকে ইসলামপুর থেকেও জন্মাষ্টমীর একটি মিছিল বের হতে থাকে।[৬]

বলাইচাঁদ ও গদাধরের মিছিল হের হবার ফলে মিছিল প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে ওঠে। পিলখানার সরকারি হাতীসমূহও একসময় অন্তর্ভুক্ত হতে থাকল মিছিলের। এর সঙ্গে ঢাকার নাযের নাজিমরা যে মিছিল করতেন তার কিছু উপাদানও অন্তর্ভুক্ত হ'ল মিছিলে।

যতীন্দ্রমোহন আরো উল্লেখ করেছেন, শুরু থেকে এ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বার নবাবপুরের মিছিল বের হয়নি। প্রথম বার, বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে; দ্বিতীয়

বার, বৃন্দাবন দেওয়ান 'রাজদ্রোহী হইয়া' যে বছর ঢাকা লুঠ করেছিলেন সে বছর; তৃতীয় বার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়; চতুর্থ বার, সামাজিক দলাদলির ফলে একবার ও পঞ্চম বার "১২৬০ সনে ইসলামপুরের প্রতিযোগিতায় বিবাদ বিসম্বাদের আশঙ্কায়।"[৭]

শেষোক্ত তথ্যটি সম্পর্কে খানিকটা সন্দেহ আছে। কারণ, ঐ বছর [১৮৫৩ সালে] ইসলামপুর ও নবাবপুর দু'জায়গা থেকেই মিছিল বের হয়েছিল এবং সংঘর্ষ হয়েছিল রায়ের বাজারের পুলের কাছে। তখন, বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার সিসিল বিডন নিজে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ঠিক করে দিয়েছিলেন– একেক দিন একেক দল [অর্থাৎ নবাবপুর ও ইসলামপুর] মিছিল বের করবে এবং তখন থেকেই এ নিয়ম চলে আসছিল।

এ সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যেই ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল জমকালো হয়ে উঠেছিল এবং এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলাদেশে। দূরদূরান্ত থেকে লোক আসত ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে। পুরো ঢাকা তখন হয়ে উঠত উৎসব নগরী। সে সময় মিছিল বা শোভাযাত্রা হ'ত কি রকম তার একটি বিবরণ পাই ঢাকার একটি সংবাদপত্রে– "তামাশায় কতকগুলো বড় চৌকি ও ছোট চৌকি এবং হাতি ঘোড়া ও পদাতিকের মিছিল বাহির হইয়া থাকে। বড় চৌকিতে পৌরাণিক ঘটনার প্রতিমূর্তি প্রদর্শিত হয়, ছোট চৌকিতে নাচ ও বিবিধ প্রকার সঙ [ং] প্রভৃতি বাহির হয়। এই সমুদয় চৌকিবেহারা স্কন্ধে করিয়া মিছিলের সঙ্গেই লইয়া যায়। ছোট চৌকিতে যে সকল সঙ [ং] ও কৌতুকজনক অনুকরণ বাহির হয়, তাহাতে অনেক প্রকার অশ্লীল গানাদি হইয়া থাকে। এই রূপ অশ্লীল গানাদি অনেক কমিয়া আসিতেছে। সর্বদাই এক পক্ষ অন্য পক্ষের [অর্থাৎ নবাবপুর ও ইসলামপুর] গালি দিতে অথবা কোন হাস্যজনক কার্যের অনুকরণ করিতে ত্রুটি করে না। একটি হাস্যজনক উদাহরণ লিখেতেছি। নবাবপুরের তামাসা কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তির গাড়ি বোধ হয় জীর্ণ অবস্থায় ছিল, গত সন তাহার নকল করিয়া ইসলামপুর পক্ষ হইতে ছোট চৌকির সঙ্গেই একখানি যারপরনাই জীর্ণ গাড়ি ও তাহার সঙ্গেই সংযুক্ত একটা শীর্ণ ঘোড়া বন্ধন করা হইয়াছিল, আর গাড়ির মধ্যে একটা মাস্তুল জাগাইয়া তাহাতে পাল ও কয়েকগাছ শুণ দেওয়া হইয়াছিল এবং গাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া এক ব্যক্তি দাঁড় ও লগি মারিতেছিল। এই রূপ চৌকি প্রায় বছরই বাহির হইয়া থাকে। বড় চৌকিগুলো তামাসার প্রধান অংশ কাঠ, বাঁশ ও কাগজ দিয়া কয়েকটা প্রকান্ড প্রকান্ড চৌকি প্রস্তুত হয়। তাহাতে নানা প্রকার চিত্র চিত্রিত হয় এবং অভ্যন্তরে পৌরাণিক ঘটনার অনুরূপ থাকে। গত সাল, পান্ডবদিগের দ্বারা দ্রুপদ রাজার লক্ষ্যভেদ এবং

আরকিমিডিস কর্তৃক কাঁচফলক দ্বারা রোমানদিগের পোত ও সৈন্য বিনাশ, এই দুইটি ঘটনার অনুকরণ দুইখানি সুদৃশ্য বড় চৌকি বাহির হইয়াছিল। এবার হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বতরাজির আনয়ন, সুগ্রীব রাবণের কথোপকথন কমলে কামিনী দর্শন প্রদর্শিত হইয়াছিল।"[৮]

এর আট বছর পর, সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেকটি বিবরণ দেখা যায়, এলিটরা মিছিলের 'অশ্লীলতা'র বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর। বিস্তারিত সে প্রতিবেদনটি উদ্ধৃত করছি– "গত মঙ্গল ও বুধবার অপরাহ্নে ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হইয়াছিল। প্রথম দিবস ইসলামপুরের এবং দ্বিতীয় দিবস নবাবপুরের মিছিল বাহির হয়। সাধারণতঃ সকলেরই সংস্কার আছে কাহাদিগের মিছিল পরে বাহির হয়। তাহাদিগেরই প্রায় হার হইয়া থাকে। কারণ পূর্ব্বদিবসীয় তামাসা দর্শন করিয়া পর দিবসীয় তামাসার উৎকর্ষ সাধন করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এবার ইহার বিপরীত ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। এবার পূর্ব্ব দিবস মিছিল বাহির করিয়াও ইসলামপুরীয়েরা প্রায় সর্ব্বাংশেই জয় লাভ করিয়াছে। কেবল অশ্লীল কুৎসা গানে এবং প্রতিপক্ষের গুপ্তগৃহচ্ছিদ্র প্রদর্শনে নবাবপুরীয়দিগের নিকটে ইসলামপুরীয়েরা বোধ হয় পরাজিত হইয়া থাকিবে। ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বরাবরই উক্তরূপ জঘন্য প্রথা নিবারণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমাদিগের সে অনুরোধ অরণ্যরোদনবৎ নিষ্ফল হইতেছে। ... ...

অতএব আমরা অন্য উপায় না দেখিয়া স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলাম যে, তাঁহারা এই জঘন্য রীতি উঠাইয়া দিতে মনোযোগী হউন। যে স্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন প্রচলিত আছে সেস্থানে প্রকাশ্য মিছিল শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত সুসভ্য ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষগণ এদেশীয় আপামর সাধারণ ভদ্র কুলবধূরা পর্যন্ত গমন করিয়া থাকেন, পরস্পর পরস্পরকে অশ্লীলভাবে গালাগালি করে, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব কর্তৃপক্ষ এ বিষয় হস্তক্ষেপ করিলে লোকে তাহাদিগকে দোষ প্রদান করিবে এ আশঙ্কা বৃথা। প্রত্যুত ভবিষ্যতে আর এই ভদ্রজন বিনিন্দিত ইতরত্ব প্রতিপাদক দূষিত রীতি দর্শন করিতে না হয়, সকলেরই ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যদিও আজি কালিকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিলে বিশেষ কিছুই নয় এবং দিন দিনই ইহার প্রতি অনেকের হতাদর হইতেছে, কিন্তু ইহা নিশ্চয়, নানা কারণে এই জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষে ঢাকায় যত লোক সমারোহ হইয়া থাকে বৎসরের আর কোন সময়েই এত লোক সমাগম হয় না। এ

সময়ে প্রায় সকল বিষয়েই বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত বড় রাস্তায় লোক ঠেলিয়া চলা সুকঠিন হয়। বিশেষতঃ মিছিলের দুই দিবস পর্যন্ত (যে ২ রাস্তা দিয়া মিছিল বহির্গত হয়) এত লোকের ভিড় হইয়া থাকে যে, দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকদিগের পদব্রজে গমনাগমন করা অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। ইহার মধ্য দিয়া আবার হস্তী ও শকট গমনাগমন করাতে লোকের কেমন কষ্ট হয় সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। অতএব অন্তত মিছিল বাহির হইবার সময়ে হাতী ও গাড়ী রাস্তায় বাহির হইতে না পারে, পূর্ব্বেই আসিয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকে, সাধারণরূপে এরূপ আজ্ঞা প্রচার করা কর্ত্তব্য। যখন উক্ত সময়ে হস্তী অথবা শকট রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিলে লোকের আঘাত প্রাপ্তির, প্রাণহানির পর্য্যন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন যে স্থানীয় শান্তিরক্ষক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, তাহাতে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।"[৯]

উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকা শহরে জন্মাষ্টমী পালনের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন গৃহবধূ মনোদা দেবীও। জানিয়েছেন তিনি, "ঢাকার এই মিছিল দেখার জন্য গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তো বটেই কলকাতা থেকেও লোকজন এসে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি উঠিয়া তাহাকে আনন্দ মুখরিত করিয়া তুলিত, তা ছাড়া, বুড়ীগঙ্গায় ছোট বড় বিপুল সংখ্যায় নৌকা সারিবদ্ধভাবে নঙ্গর গাড়িয়া থাকিত ও যথাসময়ে মিছিল দেখিতে নৌকা ঐ সব আরোহীরা দৈনিক হিসাবে ভাড়া করিয়া লইত। কখনো কখনো নির্দিষ্ট দিনে মিছিল বের হতো না বৃষ্টির কারণে। কিন্তু তারা ঐ সব তুচ্ছ করিয়াও বহু অর্থ ব্যয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখার আনন্দ উপভোগ করিতে ছাড়িত না।"[১০]

শুধু তাই নয়, পোষ্ট অফিসও সেদিন বন্ধ থাকতো।[১১] আরো পরে, এ শতকের প্রথম দিকেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। লিখেছিলো বেঙ্গল টাইমস–"*JONMOSTOMI* One *Gazetted* holiday for *Jon mostomi* Hindu festival, occurred on Friday last 2nd instant, but its annual processions have been fixed for 5th and the instant, when Dacca will be visited by large crowd of holiday seeken from far and near. For convenience of visitors, special trains will run between Naraingunge and Dacca an both those dates, during regular intervals, at suitable hours, regarding information for which application should be made to station masters of these Places."[১২]

যতীন্দ্রমোহনের বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে কুলদা নন্দ ব্রাহ্মচারীর যিনি ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভক্ত। তাঁর বর্ণনা উনিশ শতকের শেষ দশকের।[১৩]

যতীন্দ্রমোহন উল্লেখ করেছেন, একেকটি চৌকি প্রায় তিনতলা সমান উঁচু হ'ত। কাগজের বড় পুতুল দিয়ে চৌকি সাজানোর পথ প্রদর্শক শিল্পী আনন্দ হরি। তাঁর

পুত্রও নতুন উপাদান যোগ করেছিলেন। চৌকিগুলিতে তিনি নানারকম "কল সংযোজনা করিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে চৌকিগুলির দৃশ্য আশ্চর্যরূপে পরিবর্তীত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্ত বিমোচন করিতে সমর্থ হয়।"[১৪] সমসাময়িক আরেকজন সোনার ও রূপোর চৌকিতে 'নকাসি'র [নকশা] ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১৫] অ্যালেন এর ভাষ্য অনুযায়ী মিছিলে সোনা ও রূপার যে শিবিকা বহন করা হতো তার মূল্য ছিল পনের থেকে বিশ হাজার।[১৬]

"প্রথমে সুবৃহৎ পতাকা, পরে দুই পংক্তিতে সারি দিয়া বর্শা আসাসটা বল্লমধারী পদাতিকবৃন্দ, এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বহুসংখ্যক দীপাধার, তৎপরে হেমময় বিরাট কিরীট শোভিত কুঞ্জরদ্বয়, তৎপশ্চাতে সাচ্চার জরীর কারুকার্য্য শোভিত ঝুল-সমন্বিত হস্তীযূথ, পরে সুবর্ণ ও রৌপ্যময় শিরোভূষণ ও মূল্যবান ঝুলপরিহিত শতাধিক বাজীবৃন্দ শোভাযাত্রার পুরোভাগে স্থাপিত হয়। তৎপশ্চাতে বন মালাবিভূষিত পীতধড়া চূড়া পরিহিত সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বংশীকরধৃত বালকবৃন্দ শ্রীদাম সুদাম সখাসহ কেহবা ভূপৃষ্ঠে কেহবা অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। পরে দধি নবনী ভার বাহী নর্ত্তনপর গোপবৃন্দ উহার প্রত্যুদগমন করিতে থাকে। দামামা তুরি, ভেরী, রামশিঙ্গা, সানাই, টিকারা প্রভৃতি প্রাচীন বাদিত্রসহ বাদকগণ এবং সুসজ্জিত মনোরম বেশধারী অসংখ্য পৌরাণিক ও আধুনিক সং ও অভিনয় মিছিলের সহযাত্রী হয়। এতৎসমুদয়ের পশ্চাতে কাগজ ও রাং নির্ম্মিত বিবিধ মনোরম কারুকার্য্য সমন্বিত প্রায় ত্রিংশৎ সংখ্যক ছোট চৌকী এবং প্রায় বিংশতি সংখ্যক নয়নলোভন হেমময় ও রজতময় ছোট চৌকী এবং সর্ব্বশেষে বহু পদাতিক ও বাদিত্রগণ পুরোভাগে রাখিয়া রাজবেশ পরিহিত সুগৌরকান্তি নবকিশোর বয়স্ক বালক সুসজ্জিত কুঞ্জরপৃষ্ঠোপরিস্থ সিংহাসনে সমাসীন হইয়া মন্থরগতিতে উহার অনুসরণ করিয়া যাকে। ইনি মিছিলের রাজা পদবাচ্য। এই বিশালায়তন শোভাযাত্রা প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ হইয়া থাকে "[১৭] আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের কৈশোর কেটেছে ঢাকায়। এ শতকের বিশের দশকের জন্মাষ্টমীর মিছিলের একটি বর্ণনা আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। দেখা যায়, জন্মাষ্টমীর মিছিলের আকর্ষণ তখনও কমেনি। তাঁর বর্ণনায় "জন্মাষ্টমী মিছিলের খ্যাতি ছিল দূর-ব্যাপ্ত। আশেপাশের গ্রাম ভেঙ্গে লোক আসত দু'দিনের এই মিছিল দেখতে– একদিন নবাবপুরের আর অন্যদিনটিতে ইসলামপুরের। মিছিল বেরোত সন্ধ্যার মুখে যাতে 'বড় চৌকি' গুলিতে আলোর খেলা দেখানো যায় (বিদ্যুৎ নয়, কারবাইডের ল্যাম্প ও পেট্রোম্যাক্স)। হাতিতে চড়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আগে আগে আসেন, তারপরে নিশান আর ঝালর,রূপোর আশাসোটা, নানা রকমের সঙ যাতে থাকত বহু সাময়িক ঘটনা

সম্বন্ধে ব্যঙ্গ এবং বিপক্ষ দলের সম্বন্ধে বক্রোক্তি। তারপর 'ছোট্ চৌকি' (অনেকটা চর্তুদোলের মত) আর রথের মত 'বড় চৌকি'। সবশেষে আবার হাতি যার নাম 'রাজার হাতি'। শহরের সবচেয়ে বড় উৎসব। অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ সব দু'দিনের জন্য ছুটি।"[১৮]

চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেনও প্রায় একই সময়ের জন্মাষ্টমীর মিছিলের বর্ণনা লিবিদ্ধ করতে ভোলেন নি তাঁর আত্মজীবনীতে। অপূর্ব সে বর্ণনা যেন চোখের সামনে এক শিল্পী আঁকছেন আর তার প্রতিটি টানে আস্তে আস্তে ক্যানভাসে ফুটে উঠছে ছবি। দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও তথ্যের খাতিরে বর্ণনাটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল--

"শ্রাবণের একটি রৌদ্রচুম্বিত বিকেল বেলা। যে দিকেই তাকাই না কেন রাস্তা-ঘাটে, ছাদে কার্নিশে, বারান্দায়-রোয়াকে, দরজায়-জানালায়, গাছে ল্যাম্প পোষ্টে সর্বত্রই কালো কালো বিন্দু। এক কথায় কালো বিন্দুর এক মহাসমুদ্র। গোটা ঢাকা শহর এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আর উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। আজ জন্মাষ্টমীর মিছিল বেরুবে। এমন জাঁকালো, এমন বিশালাকার এবং অসাধারণ চমৎকারিত্বপূর্ণ একটি ঘটনা এই উপমহাদেশে আর কোথাও কি দেখা যায় ? যে জাদুকরি হাত জগদবিখ্যাত মসলিন কাপড়ের স্রষ্টা, এই মিছিল সে-হাতেরই এক আশ্চর্য কারিগরির যোগফল যেন। দুদিন ধরে এই বিন্যাসপূর্ণ, সাত রঙা মিছিল, ক্রমগত পরিবর্তনশীল, অতিকায় একটি নকশিকাঁথার মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। ঠিক যেন একটি ক্যালিডোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখছি। সক্রিয় অংশীদাররা হিন্দু হলেও আক্ষরিকভাবে এ মিছিল সর্বজনীন।

অপরাহ্ণে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ধূলোর চিকের ভেতর দিয়ে দূরে, কালো পাহাড়ের মতো আবছা একটি পুঞ্জিত ছায়া দেখা যায়। তাই দেখে, কালো বিন্দুর সমুদ্রে উত্তেজনার মস্ত ঢেউ ওঠে। এই পাহাড়টি ভিড় ঠেলে কচ্ছপের চালে এগিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই আবছা মূর্তিটা জাঁকজমক পোশাকে সজ্জিত একটি বাস্তব হাতিতে রূপান্তরিত হয়। 'আসছে, ঐ আসছে'- সহস্র কণ্ঠের এই আওয়াজ, বাবুর বাজারের দিক থেকে, আকাশে উঠে, একটি শব্দ তরঙ্গের মতো আমাদের দিকে ভেসে আসে। কী উন্মাদনা! কী ঠেলাঠেলি! যতদূর চোখ যায়, শুধু রঙ থাকে থাকে সাজানো। আক্ষরিকভাবে রঙের গাঙে যেন জোয়ার আসছে। হাতির পেছনেই কী অপরূপ এক দৃশ্য-গ্যালারির পর গ্যালারি। উচ্চতায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট। বাহুযুক্ত গরুর গাড়ির ওপর বসানো। এ গাড়িগুলোকে টানছে জোড়া চোড়া বলদ। এই গ্যালারির মাঝখানে একটি মঞ্চ। তার গর্ভগৃহে, খাঁটি সোনা কিংবা রূপোর চৌকি কিংবা সিংহাসন। সেখানে বৈষ্ণব দেবদেবীর মূর্তি। তার সামনে পৌরাণিক

কাহিনীর মূকাভিনয় অথবা ভক্তিমূলক নাচ-গান চলে। কখনো বা নিছক খ্যামটা নাচ। কী অসাধারণ এক জমজমাট ব্যাপার। অনেকটা প্রতিমার চালার আকারে, দুপাশ দিয়ে উঠেছে কাঠ কিংবা বাঁশের কঠামো। তাতে নানা নকশার রাংতা আর শোলার অলংকরণ। এই কাঠামোর একের পর এক, নিশ্চল পুতুলের মতো, নানাভাবের নানা জ্যান্ত মূর্তি, মেয়েদের পোশাকে। জরি, পুঁতি এবং চুমকির কাজে এবং কারবাইডের আলোর মালায়, এই পোশাকগুলো এমনই ঝলমল করে যে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়! গ্যালারির সারি পার হবার পরই, ঢেউ-এর মতো, নৃত্যরত সঙ-এর দল আসে। তাদের মুখে কবিগান, কীর্তন, বিদ্রুপাত্মক সামাজিক ছড়া, জাতীয়তাবাদী গান। হাতে খঞ্জনী আর করতাল। বাদ্য এবং কণ্ঠসঙ্গীতের কী নিখুঁত ঐক্য। মনে হয় একটি মাত্র কণ্ঠ, একটি মাত্র বাদ্যের ধ্বনি। তারপরেই, রাজপুত বীরের বেশভূষায়, তলোয়ার উঁচিয়ে আসে অশ্বারোহী দল। তাদের দু'পাশে সারি সারি রঙের ঝলমল নিশান, অতিকায় মখমলের ছত্র, পাখা, চামর, বর্শা, আরো কত কী। সঙ্গে আছে ঢাক-ঢোল-নাকাড়া-শিঙা, এমনকি ব্যান্ড-পার্টিও। সামরিক সংগীতের গমগমে শব্দচাঞ্চল্যে আকাশ-বাতাস ভ'রে ওঠে। যেন কয়েকশো পাখোয়াজ একই সঙ্গে, একই বোলে বেজে উঠেছে। তারপর, আরো সঙ, আরো ঘোড়া, আরো হাতি, আরো গ্যালারি এক অন্তহীন, সচল, সাড়ম্বর, অদৃশ্যপূর্ব প্রদর্শনী।

দু'দিনব্যাপী মিছিলের পর জন্মাষ্টমী উৎসবের আরেকটি অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ নবাবপুরের 'বড়ো- চৌকী'। মিছিলের মতো এটিও আরেক অসাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা।

সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের সৃজনীশক্তির কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে? যেমনি নকশার ভাব, তেমনি অলংকরণ, আর তেমনি অনুপাত জ্ঞান। হিন্দু-মুসলমানী নকশার কী অপূর্ব সমন্বয়! আর রঙের তো রীতিমতো দাঙ্গা লেগেছে। আগাগোড়া রাংতা, রঙীন কাগজ এবং কাপড় দিয়ে মোড়া। তার ওপর সোনা রূপোর ছড়াছড়ি। নবাবপুরের সাবেকী ছাতা-পড়া বাড়িগুলো এবং রাতের কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকায় চৌকিটি, নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে, এক পরীর রাজ্যের মতো ডগমগিয়ে উঠেছে। চৌকির মাঝামাঝি উচ্চতায় দ্বিগুণ পূর্ণাবয়ব পুতুল খেলার মাধ্যমে মহাভারত, রামায়ণ এবং অন্যান্য পালা রাতের পর রাত চলে। এইসব পুতুলের গঠনগাঠন, আঙ্গিক, রঙ, হাত-পা-মাথা ইত্যাদি নাড়াবার ভঙ্গি- একথায় তাবৎ নান্দনিক বিচার এবং সংযম দেখে, অজ্ঞাত, অশ্রুতকীর্তি শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা-আপনিই মাথা নুয়ে পড়ে। এই চৌকিতে আজ রাবণবধ পর্ব চলেছে। সে কী ভয়ানক দৃশ্য! যেমনি রাম-লক্ষ্মণের হাত পা এবং মুখের ক্ষিপ্র গতি এবং মারাত্মক

সব অস্ত্র নিক্ষেপ, তেমনি রাবণ তার বিরাট খড়্গ দ্রুত চালিয়ে চারপাশের হাওয়াটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। তার হাতের চকচকে এই অস্ত্রটি থেকে ঝটিকাক্ষুব্ধ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুতের আলো জিহ্বা লকলক করে। সেই আগুনে রাম-লক্ষ্মণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর কী! তাই দেখে আমার চোখের পলক থেমে যায় বুক ধড়ফড় করে উঠে। সব মিলে এক অদৃশ্যপূর্ব, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।"[১৯]

উপরে, জন্মাষ্টমীর মিছিলের যে কটি বর্ণনা দিয়েছি, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আদিতে জন্মাষ্টমী পালন বা জন্মাষ্টমীর মিছিল ছিল একান্ত ভাবে ধর্মীয়। কালক্রমে এই ধর্মীয় গন্ডি বেশ খানিকটা ভেঙে পড়েছিল। এবং এ কারণে, যে মিছিল ছিল ঢাকার প্রধান উৎসব, সে মিছিল, পরিতোষ সেনের ভাষায়, 'সক্রিয় অংশীদাররা হিন্দু হলেও আক্ষরিকভাবে এ মিছিল [ছিল] সর্বজনীন।' একথা স্বীকার করেছেন পরিতোষ সেনের সমসাময়িক কামরুদ্দীন আহমদও। লিখেছেন তিনি, "জন্মাষ্টমীর মিছিল যেমন হিন্দু মুসলমান, নারী-পুরুষ সকলেরই কাছে প্রিয় ছিল মহরমের মিছিল তেমনটি ছিল না।"[২০]

কোন উৎসব সর্বজনীন রূপ পায় তখন, যখন এর ধর্মীয় রূপটি ক্ষীণ হয়ে যায়। আদিতে হিন্দুধর্মের উপাদানগুলি মিছিলে প্রধান হলেও কালক্রমে ঢাকার নানাবিধ সামাজিক ও লোকায়ত উপাদান দখল করে নিয়েছিল মিছিলের একটি প্রধান অংশ। যে কারণে এ মিছিল সৃষ্টি করত উত্তেজনার, আগ্রহের। এ জন্য এ মিছিল পেয়েছিল এক সর্বজনীন রূপ।

জন্মাষ্টমী মিছিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মিছিলে সঙ বা সঙের মিছিল। সঙের মিছিলে বিভিন্ন রকম গান করা হ'ত। এবং সময়ের বিবর্তনে তা পরিবর্তিতও হ'ত। জন্মাষ্টমীর সঙের গান দেখে বিশেষ বিশেষ সময়ের রূপ বোঝা যায়।

১৮৬৪ ও ১৮৭২ সালের বর্ণনা থেকে দেখা যায়, দু'টি মিছিলে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের নেতৃত্বস্থানীয়দের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছে।। বিশেষ ঘটনার বর্ণনাও স্থান পাচ্ছে তাতে এবং এ ধারা অব্যাহত ছিল এ শতকের প্রথমার্ধেও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাবু কালচারের উপাদানসমূহ, যেমন– অশ্লীল গান, নাচ ও খেমটা। বলে রাখা ভালো যে, উনিশ শতকে ঢাকার খ্যাতি ছিল গান বাজনা, বাঈজী ও বারাঙ্গনার জন্য। ফলে এ কালচারের ছাপ মিছিলে খানিকটা পড়া ছিল স্বাভাবিক। কারণ, মিছিলের নেপথ্যের আয়োজকরা ছিলেন নবাবপুর ও ইসলামপুরের ধনাঢ্য বণিক যাঁরা কোন না কোনভাবে ছিলেন বাবু কালচারের পৃষ্ঠপোষক।

আবার স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইসলামপুরের মিছিলে সঙের গান ছিল এ রকম–

"চলে যায় দিন ভেবে দেখ,
এমন দিন আর পাব কোথায়
সাধের বেড়ি পরবো পায়,
যাব সাধের জেলখানায়।"[২১]

আরেকটি উদাহরণ

"কতগুলি পাষন্ড
গোলামগিরি বোঝে না,
ঘরে গেলে পড়ে যাবে
মনের ধান্দা জোটে না।
তাতে বলে হিতবাণী,
বলতে গেলে শোনে না,
দন্ডধারী গাধা পিটলে,
ঘোড়া কভু হয় না।
ধরে যখন কানমলা দেয়,
তখন বাঁধা থাকতে পারে না।"[২২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং এ শতকের প্রথমার্ধে দেখা যাচ্ছে, লাঠিসোটা হাতে লাঠিয়ালরাও জড়িত হচ্ছে মিছিলে। ঢাকায় ছিল সে সময় বেশী কিছু আখড়া যেখানে নিয়মিত চর্চা হ'ত কুস্তি ও লাঠিখেলার। এদের অনেকের উপাধি ছিল 'ডনগীর'। মুহররমের মিছিলেও থাকত এরা। এ সব মিছিলে ডনগিররা বা আখড়ার সদস্যরা নিজেদের জাহির করতে চাইবে এটা স্বাভাবিক। অবশ্য, এ উপাদান মুহররম ও ঈদ মিছিলের প্রভাবও হতে পারে। মুহররম ও ঈদ মিছিলে নায়েব-নাজিমরা নেতৃত্ব দিতেন এক সময়। কামরুদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, 'জন্মাষ্টমীর মিছিলে হাতীর উপর হাওদায় উঠতেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ।'[২৩]

বিশ শতকে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বসতেন হাওদায়। এবং হাতির পিঠে তার নেতৃত্ব একদিকে যেমন মিছিলের গুরুত্ব অন্যদিকে তেমনি এর সর্বজনীনতা বৃদ্ধি করেছিল।

জন্মাষ্টমীর মিছিল প্রথমে বেরুত দিনে। পেট্রোম্যাক্স ও কারবাইড চালু হওয়ার পর মিছিলে সময় চলে গেলে বিকেল বা সন্ধ্যায় যাতে বাতির খেলা দেখান যায়। জন্মাষ্টমীর মিছিলে নিশান হাতে যোগ দিত লক্ষ লক্ষ মানুষ। মুহররম ও ঈদের মিছিলেও থাকত ঝলমলে নিশান। কাড়া নাকাড়া, শিঙ্গা, নিশান এসব এসেছে ঈদ ও মুহররমের মিছিল থেকে।

পরিতোষ সেনের বিবরণ থেকে জানা যায়, মিছিল শেষের আকর্ষণ ছিল নবাবপুরের 'বড়ো- চৌকি।' তাঁর ভাষায়, সেখানে ছিল 'হিন্দু-মুসলমানী নকশার কী অপূর্ব সমন্বয়।' আর যে সব পালা অভিনীত হ'ত যে চৌকিতে তার ভিত্তি ছিল লোকায়ত। জন্মাষ্টমীর মিছিল কবে লুপ্ত হয়েছিল; নির্দিষ্ট ভাবে সে সময় জানা যায়নি। তবে, খুব সম্ভব এ শতকের তৃতীয় দশকে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের যখন অবনতি ঘটতে থাকে, তারপর পাকিস্তান আমলে সরকারি আদেশে তা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, এর ফলে ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের অনেকেই ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন, যারা ছিলেন মূলত এর পৃষ্ঠপোষক। এছাড়া, এ পরিপ্রেক্ষিতে মিছিলের ওপর ধর্মান্ধ মুসলমানদের হামলাও এর কারণ। পরিতোষ সেনের লেখায় এর খানিকটা ইঙ্গিত আছে– "একবার সময় উল্লেখ করেননি; তৃতীয় দশক হবে। এই মিছিলে, আমাদের পাড়ার মসজিদের সামনে দিয়ে যাবার সময় শত শত মুসলমান, লাঠি- সোটা, ইট-পাটকেল হাতে নিয়ে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লোক-দ্রুতগামী গাড়ির তলায় চাপা পড়ার ভয়ে মুরগী ছানা যেমন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে, ঠিক তেমনি করে পালাতে থাকে। বে-পাড়ার অনেক হিন্দুই জখম হল।... ... বলাবাহুল্য এই দাঙ্গা লাগাবার প্রস্তুতি আগে থেকেই করা হয়েছিল, সরকারি প্ররোচনায়।"[২৪]

ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিল বন্ধ হয়ে যাবার পর বাংলাদেশে আর কোন অঞ্চলে জন্মাষ্টমী তেমনভাবে পালিত হয় না, হলেও তা হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

তথ্যনির্দেশ

১. নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ*, ষষ্ঠ ভাগ,কলকাতা, ১৩০২, পৃ. ৬০৫-৬০৬
২ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, জন্মাষ্টমী, *ভারত কোষ*, ৩ খন্ড, কলকাতা, পৃ. ৪৫০
৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ভুবনমোহন বসাক, *জন্মাষ্টমী মিছিলের ঢাকা ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯১৭
৪. যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ৩৭৬-৭৭
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৬৪; ঢাকার ইংরেজী সাপ্তাহিক, 'ঢাকা নিউজ' ১৮৫৭ সালে লিখেছিলো - "The infantry Volunteers were posted on both days in the college, and the cavalry moved up and down the roads on elephents, under the direction of their commandant. The crowd on there our great

festival days in Dacca was we think as great as usual and perfecetly orderly and quiet."

৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৭২

১০. মনোলা দেবী, 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী', *এক্ষণ* ১৫/৩-৪ সংখ্যা), কলকাতা, বর্ষা ১৩৮৯. পৃ. ১১৫

১১. *Estrem Bengal and Ansam Era*. Dacca. Sept. 1. 1915. p-5. উদ্ধৃত, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সত্ত প্রসঙ্গে*, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৯০

১২. *The Bengal Times*. Sept. 1904

১৩. কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, *শ্রী শ্রী সদগুরু সঙ্গ*, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৪. যতীন্দমোহন রায়, 'ঢাকার জন্মাষ্টমী' *ভারত বর্ষ*, ১/৪ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২০, পৃ. ৫০৫-৫১১

১৫. মহিমচন্দ্র ঠাকুর, 'ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল, *প্রবাসী*, ১১ ভাগ, ২ খন্ড, কার্তিক, ১৩১৮

১৬. B. C. Allen. Eastern Bengal District Gazetteers. *Dacca*. 1916. p-66.

১৭. যতীন্দ্রমোহন, প্রাগুক্ত

১৮. ভবতোষ দত্ত, *আটদশক*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮

১৯. পরিতোষ সেন, *জিন্দাবাহার*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৬-৬৮

২০. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ঢাকা, ১৩৮২, পৃ. ৩৯

২১. বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

২২. ঐ, ৯০

২৩. কামরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত

২৪. পরিতোষ সেন, প্রাগুক্ত

দুর্গাপূজা

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। এক সময় যখন ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণের ওপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি এবং জোরদার হয়ে ওঠেনি হিন্দু ও মুসলমান পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন, তখন গ্রামাঞ্চলে দুর্গাপূজায় যোগ দিতেন আপামর পল্লীবাসী। এর একটি সামাজিক দিক ছিল যা ছাপিয়ে উঠত ধর্মীয় দিক। গ্রামের জমিদার বা ধনী গৃহস্থ পূজার সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসেবে আয়োজন করতেন ভোজ, থিয়েটার, নানা অনুষ্ঠান। ধর্মীয় ভেদাভেদ ততটা প্রখর না থাকায় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্যের কারণে, শুধু আধিপত্য নয়, সামাজিক কারণেও যোগ দিতেন সবাই। আর কিছু না হোক,ঐ একটি দিন গ্রামীণ সমাজের একঘেঁয়ে জীবন যাপনে আসত বৈচিত্র্য। সেটিই ছিল পূজার সামাজিক এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক।

দুর্গাপূজার উৎস বিচার নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, ফলে, এর উৎস ও বিকাশের ইতিহাস হয়ে উঠেছে অতি জটিল। যেমন, কৃত্তিবাসের রামায়ণে, শরৎকালে রামকে দিয়ে অকাল বোধন করিয়ে দুর্গাপূজা করান হয়। আবার পুরানে দেখা যায়, বসন্তকালে রাজা সুরথ করিয়েছিলেন দুর্গাপূজা। এখন সে পূজা পরিচিত বাসন্তী পূজা নামে।

বিখ্যাত পন্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দুর্গাপূজার মূল একেবারে নিয়ে গেছেন প্রাচীণকালে। তাঁর মতে, "এক সময় প্রাচীনকালে, ভারতে ঋষিরা ধ্যানের সময় আগুন না জ্বালিয়ে নিভিয়ে রাখতেন, হয়ত দেশে তখন বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। তারা অগ্নি পূজা করতেন না বটে কিন্তু বেদী রক্ষা করতেন। এক সময় দেশের অবস্থা ফিরলে 'অগ্নির নিকট হবি প্রভৃতি দানের দরকার' হ'ল। কিন্তু, তারা আগুন না জ্বালিয়ে সেখানে 'দক্ষকন্যা' বা কুন্ডের ওপর 'পীতবর্ণের মূর্তি স্থাপন করতেন। মূর্তিটি ছিল অগ্নির প্রতীক। এবং তার নামকরণ করা হয়েছিল 'হব্যবাহনী।' এই মূর্তিই পরে পরিণত হ'ল দুর্গায়। 'কুন্ডের দশদিক দুর্গার দশহাত' এবং বৈদিক যুগের শেষ দিকে দেখা যায় 'দক্ষকন্যা' ক্রমশ উমাতে পরিণত হইলেন, 'উমা' 'অম্বিকা'য় এবং 'অম্বিকা' দুর্গায় পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন না।"[১]

রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন, 'বাঙালী সভ্যতার ইতিহাস দুর্গোৎসবের সহিত জড়িত। বাঙ্গালী যদি নিজেকে ভাল করিয়া জানিতে চায় তবে তাহার দুর্গোৎসবের ইতিহাস অনুশীলন করা উচিত।'[২] তবে, এটাও তিনি স্বীকার করেছেন, দুর্গাপূজার আমরা যত প্রাচীন উৎসই খুঁজি না কেন, সবচেয়ে প্রাচীন যে মহিষমর্দিনীর মূর্তিটি পাওয়া গেছে তা পঞ্চম শতাব্দীর।[৩]

তবে, দুর্গাপূজা সম্পর্কে যারাই আলোচনা করেছেন, তারা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, দুর্গাপূজা অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। কত প্রাচীন তা অবশ্য নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। চন্দ মনে করেন, সম্ভবত তামসী পূজায় এই উৎসবের সূত্রপাত এবং সাত্ত্বিকী পূজায় ইহার চরম পরিণতি।' তাঁর মতে, সভ্যতার তিনটি পর্যায়ে মানুষ তিন রকমের পূজা করতেন। সাত্ত্বিকী পূজায় দেয়া হয় নৈবেদ্য তবে তা আমিষ নয়, করা হয় জপ ও যজ্ঞ। রাজসী পূজায় দেয়া হ'ত বলি এবং নৈবেদ্য হ'ত আমিষের। তামসী পূজায় জপ, যজ্ঞ, মন্ত্র, কিছুই লাগত না তবে নৈবেদ্য দেওয়া হ'ত মদ মাংস দিয়ে।[৪]

অন্যদিকে, যোগেশচন্দ্র বাগল এক দীর্ঘ প্রবন্ধে দুর্গাপূজার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, দুর্গাপূজার পুরো ব্যাপারটিই জটিল হয়ে পড়েছে। কারণ, এর 'আনুষঙ্গিক অসংলগ্ন অঙ্গ দেখিলে মনে হয়', এক দেশে তা 'প্রবর্তিত ও বর্ধিত' হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আচার বিধি বিভিন্ন সময় এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন, অম্বুবাচির (পূজিত) ভদ্রকালী পরে রূপান্তরিত হয়েছেন দুর্গায়। এবং দুর্গাপূজার আগে পূজা হ'ত ভদ্রকালীর, পরে শরৎকালে শুরু হয়েছে দুর্গাপূজা এবং দশভুজা দুর্গা প্রতিমার রং হবে, 'অতশী পুষ্প আনীল'। অতসী পুষ্প বাংলাদেশে পরিচিত তিসি হিসেবে। তিনি অবশ্য এও উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশে ভুলে শন-পুষ্পী অতসী হিসেবে পরিচিত। তবে, কোনভাবেই প্রতিমা 'চম্পকবর্ণা' হবে না কারণ, তা অশাস্ত্রীয়।[৫]

বলা যেতে পারে, প্রাচীনকালে দুর্গাপূজা হয়ত হ'ত, কিন্তু তার প্রকৃতি ও রূপ ছিল ভিন্ন। এখন যে দুর্গাপূজা প্রচলিত বাংলাদেশে তা সম্পূর্ণ বঙ্গীয় ব্যাপার। প্রাচীন পদ্ধতিরই লৌকিকরূপ যা বর্তমানে পরিণত হয়েছে শারদীয় উৎসবে।

তিনটি স্তর আছে দুর্গাপূজা বা উৎসবের। 'একটি নিছক শক্তি আরাধনার স্তর। একটি শাক্ত পুরাণের স্তর। আর অপরটি সামাজিক গার্হস্থ্য উৎসবের স্তর।' অকাল বোধন বলেও তা পরিচিত। কারণ, আষাঢ় থেকে কার্তিক– এ ক'মাস দক্ষিণায়নে নিদ্রিত থাকেন দেবতা। এ সময়টি দেবীপক্ষ এবং 'বেদী পূজার প্রশস্ত কাল', অনেকের মতে, এর একটি প্রাকৃতিক দিকও আছে, আষাঢ় মাস আলস্যের মাস। বর্ষার পর এক ধরনের আলস্য বোধ করেন সবাই– "কাজেই শারদীয় উৎসবের উৎসাহে এই তামসিকতা দূর করার উৎকৃষ্ট বিধি। ইহা বলাইবাহুল্য, প্রাকৃতিক বিধানে দুর্গোৎসবের আকর্ষণটা বাংলার সব সম্প্রদায়ের লোককেই অল্পবিস্তর ছোঁয়া দিয়ে যায় এবং অধ্যাত্ম উন্নতির দিক দিয়াও না হউক, উৎসবের উল্লাস স্বাস্থ্যের পক্ষে যে, হিতকর ইহা অবধারিত।"[৬]

তবে, এটি সত্য যে, বাংলাদেশে দুর্গাকে অবলম্বন করে উৎসবের একটি পরম্পরা অনুষ্ঠিত হয়, সাধারণত আশ্বিনের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অকাল বোধন হয় দুর্গার। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিন দুর্গাপূজা। বিজয়া দশমীতে বিসর্জন। বিজয়ার পরদিন থেকে পনের দিন ধরে চলে বিজয়ার কোলাকুলি। প্রণাম ও আশীর্বাদ। আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে দুর্গার বড় মেয়ে লক্ষ্মীর পূজা। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে দুর্গার পুত্র কার্তিকের পূজা। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দুর্গার ছোট মেয়ে সরস্বতীর পূজা। মাঝে আশ্বিনের অমাবস্যা তিথিতে দুর্গারই আরেক রূপ কালীর পূজা। আশ্বিনে দুর্গাপূজা দিয়ে যার শুরু, মাঘে সরস্বতী পূজা দিয়েই তার শেষ। দুর্গা, লক্ষ্মী, কার্তিক, সরস্বতী এভাবে সকলেরই আলাদা আলাদা পূজার বিধান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কেবল, গণেশের পূজার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই, কারণ, হিন্দুদের যে কোন দেব- দেবীর পূজার আগে গণেশের পূজা করে নিতে হয়। 'ওঁ গণেশায় নমঃ' না বলে কোন দেব- দেবীর পূজাই করা চলে না।[৭]

দুর্গাপূজা কখন শুরু হয়েছে সে বিষয়ে গবেষক ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আকবরের চোপদার রাজা কংসনারায়ণ বাংলার দেওয়ান (তাহিরপুরের রাজা হিসেবেও পরিচিত) হয়েছিলেন ষোড়শ শতকে। তাঁর পিতামহই ছিলেন রাজা গণেশের শ্যালক। যাহোক, দেওয়ান হওয়ার পর কংসনারায়ণ চাইলেন মহাযজ্ঞ করতে। রাজার পুরোহিত ছিলেন বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য বংশ। এ বংশের রমেশ শাস্ত্রী সে সময় সমগ্র বাংলা-বিহারে শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি রাজাকে জানালেন, যে চাররকমের যজ্ঞ করার নিয়ম আছে তার কোনটিই এ আমলে করা সম্ভব নয়। রাজা যেন বরং দুর্গাপূজা করেন। এবং দুর্গোৎসব পদ্ধতিও লিখে দিয়েছিলেন তিনি। রাজা প্রায় আট নয় লক্ষ টাকা খরচ করে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করেছিলেন। সেই থেকে দুর্গাপূজার শুরু।

কিন্তু, বাংলাদেশে এক সময় দুর্গাপূজাই হিন্দুদের সর্বজনীন এবং সবচেয়ে বড় পূজা ছিল বলে মনে হয় না। বিভিন্ন তথ্য দেখে মনে হয়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বড় উৎসবে পরিণত হতে দুর্গাপূজার আরো শ'তিনেক বছর লেগেছে। যেমন, এ শতকের ত্রিশ দশকেও 'ঢাকার মত বৈষ্ণব প্রধান শহরের সবচেয়ে বড় উৎসব

দুর্গাপূজা নয়।[৮] উনিশ শতকের মধ্যভাগেও ছিল না তা– অন্তত হৃদয়নাথ মজুমদারের আত্মজীবনী দেখে তাই মনে হয়।[৯] সমসাময়িক সিলেটের অবস্থাও তাই ছিল। শম্ভুচন্দ্র দে লিখেছেন, দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা হলেও সিলেটে ছিল তা গুরুত্বহীন। দুর্গাপূজায় আনন্দ হয় ঠিকই, তবে সে রকম নয়, যে রকম হয় বিষহরি বা কার্তিক পূজায়।[১০]

দুর্গাপূজা প্রবল উৎসবে পরিণত হয়েছিলো প্রথমে কলকাতায়। শুধু নিছক উৎসবের জন্য নয়, প্রভু ইংরেজদের মনোরঞ্জন ও যোগাযোগের জন্যও উচ্চবর্গ ও মধ্যবিত্ত ব্যবহার করত দুর্গাপূজা। এর প্রচুর বিবরণ ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, নকশা, উপন্যাস-এ। আমি এখানে আলোচিত একটি পুস্তিকার সামান্য উদ্বৃতি দিচ্ছি-

"... ... মহামায়ার শুভ আগমনে যে কেবল হিন্দুরা আহ্লাদে ফুটিফাটা হল তা নয়, ইংরাজ ফিরিঙ্গিরাও এ সময়ে আমোদ করিতে ছাড়েন না। সম্বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে এই একটি বিশেষ সময়। .....

পূর্ব্বের দুর্গোৎসবে আর এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বের পূজা মানসিক ছিল, আর এখনকার পূজা তামসিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাচ, তামাসা লইয়া এখন লোকের পূজা।"[১১]

উনিশ শতক থেকে হয়ত আস্তে আস্তে কলকাতার পূজোর রেশ ছড়িয়ে পড়েছিলো বাংলাদেশে এবং কলকাতায় অবস্থানরত অনুপস্থিত ভূস্বামী ও ধনাঢ্যরা কলকাতায় আমোদ স্ফূর্তি তামাশার একটি অংশ আবার শুরু করতে চাইলেন নিজ নিজ অঞ্চলে। এ অঞ্চলে দুর্গাপূজার সমারোহ, জনপ্রিয়তা, সর্বজনীন উৎসবে পরিণত করার পেছনে প্রধান ভূমিকা জমিদারদের। এছাড়া মধ্যবিত্ত, ধনাঢ্য পেশাজীবীরা যারা প্রধানত থাকতেন কলকাতা বা ঢাকায় তারাও আসতেন পূজোর ছুটিতে গ্রামে। মূল উদ্দেশ্য সবার ছিল একই- ঐশ্বর্য (আধিপত্য) ও প্রজাদের প্রতি 'স্নেহ উদারতা' প্রদর্শন।

দুর্গাপূজার বর্ণনা পাওয়া যাবে অনেক আত্মজীবনীতে, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতে। কিন্তু তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কিভাবে পূজা পালিত হ'ত তার বৈচিত্র্যময় বা বিস্তারিত বিবরণ নেই তেমন। মধ্য উনিশ শতক থেকে সাধারণ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন, কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছিলেন–

"দুর্গাপূজার আমোদই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পূজার প্রায় একমাস পূর্বেই আমরা পড়াশোনায় মনযোগ দিতাম না। .... আশ্বিন মাস আসিতেই আমাদের মনে

দুর্গাপূজার আনন্দ অনুভব করিতাম। প্রাতে পড়াশোনা না করিয়া নদীর তীরে দল বাঁধিয়া বেড়াইতাম।"

ঢাকের বাদ্য ও প্রতিমা গড়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হতো পূজোর উৎসব। শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল তাই প্রধান আকর্ষণ। তারপর শুরু হতো আত্মীয়-স্বজন ও বড় কর্তাদের আসার পালা-

"... শরৎকালে বিলময় দেশে জল থই থই করিত, তার ভিতরে প্রায় ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব হইত। আনন্দের প্রবাহে কোটালীপাড়া যেন ভাসিয়া চলিত। পাঁঠা বলির অন্ত ছিল না। কোটালী পাড়ার অবস্থাপন্ন বিভিন্ন বাড়িতে অন্যূন ৬০টি বলি হইত। ঢাক, ঢোল, নাগরা, টিকার বাদ্যে ৫/৬ দিন কাল জলময় দেশ মুখরিত থাকিত। গান, বাদ্য, আহার, বিহার এবং আমোদ প্রমোদে, বালক বৃদ্ধ যুবার ধূমধাম আহোরাত্র চলিত। আমরা বালকদল, পুষ্পচয়নে, রাত্রি জাগিয়া গানবাদ্য শ্রবণে নানাবিধ আমোদ কৌতুকে। বলির সময় রুধির অঙ্গে লেপনে, আরতির সময়ে দলবদ্ধ নৃত্যে, নিমন্ত্রণ সবার ভূরিভোজনে দিবারজনী অতিবাহিত করিতাম। বিসর্জনের দিনে অশ্রু সিক্ত হইয়া কয়েক দিন বড়ই অবসন্ন ও বিষন্ন প্রাণে কাটাইতাম।"[১৩]

দুর্গাপূজার প্রধান আকর্ষণ ছিল যা আগেই উল্লেখ করেছি, আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, যেমন ভোগ, থিয়েটার, সংকীর্তন, ঢপ, যাত্রা প্রভৃতি। যা গ্রামের প্রজাদের জন্য ছিল উন্মুক্ত। ফলে, নিরানন্দ গ্রামে, নিরক্ষর গ্রামবাসীরা উত্তেজনাপূর্ণ একদিনের জন্য অপেক্ষা করতেন।

অধ্যাপক যতীন সরকার আমাকে জানিয়েছেন, ময়মনসিংহে মুক্তগাছা ও গৌরীপুরের জমিদারদের দুর্গাপূজা ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেক মাইল হেঁটে প্রজারা জমিদার বাড়িতে পূজা দেখতে যেতেন। পূজা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হ'ত যাত্রা, কবিগান, ঢপকীর্তন ইত্যাদি। মুক্তাগাছাতে বিজয়ার দিন হাতির মিছিল হ'ত। প্রজারা পূজার একদিন রাজবাড়ির পূজা মন্ডপে প্রাণভরে খেয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করতেন।

ময়মনসিংহের সমৃদ্ধ কিছু গ্রামেও পূজা উপলক্ষে বেশ ধূমধাম হ'ত। নেত্রকোণার আশুজিয়া, নওপাড়া, বাড়রি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ তালুকদার অধ্যুষিত গ্রামে অনেক বাড়িতে স্থাপন করা হ'ত পূজামন্ডপ। এসব গ্রামের 'বাবু'দের অনেকেই এবং তাদের ছেলেমেয়েরাও থাকতেন হয় ঢাকায়, নয় কলকাতায়। পূজোয় তারা বাড়ি আসতেন ও পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটারের ধূম পড়ে যেত।

বর্ণহিন্দু ছাড়া তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যারা ছিলেন বিত্তশালী তারাও দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিজেদের 'সম্মান' বাড়াবার চেষ্টা করতেন। তারা অবিকল অনুকরণের চেষ্টা করতেন বর্ণ হিন্দুদের যা, বর্ণহিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা মোটেই পছন্দ করতেন না। এমনকি নিম্নবর্ণের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা-প্রণামও ছিল নিষিদ্ধ।[১৪]

এ শতকের ত্রিশ দশকে পূর্ববাংলার প্রধান শহর ঢাকায় কিভাবে পালিত হ'ত দুর্গাপূজা তার বিবরণ পাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের আত্মজীবনীতে।

"... বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত কলেজে (জগন্নাথ কলেজ) দুর্গাপূজা হতো না। তাই পূজো দেখতে যেতাম পাবনা'র জমিদার বাড়ি, আর বিসর্জন দেখতাম ভৈরব নদের ওপারে সেনহাটির কাছে গিয়ে।....

পূজো দেখতে যেতাম মৈশুন্ডি, যেখানে এক বাড়িতে লাল দুর্গার প্রতিমা তৈরি করা হত। আর যেতাম সূত্রাপুরে 'ঢাকার বাবু নন্দলালের' বাড়িতে যেখানে দোতলা প্রমাণ বড় প্রতিমা হত। সবচেয়ে বেশি যেতাম টিকাটুলি ছাড়িয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পূজোয়। আমরা সবাই মিলে কাজ করতাম— ভিড় সামলানো থেকে দর্শনার্থীদের জুতোর খবরদারি করা পর্যন্ত। সন্ন্যাসীরা কীর্তন করতেন, আমরাও তাতে যোগ দিতাম। কার লেখা জানি না- লাইনগুলো এখনো মনে আছে–

শুনেছি পুরাণে দেবতা সকলে মাকে নাকি ডেকেছিল
দেবতার সেই কাতর আহবানে মায়ের আসন টলেছিল
উদয় হইয়ে, অসুর নাশিয়ে অভয়া অভয় দিয়েছিল
বিপদে পড়িয়ে মা বলে ডাকিলে আবার আসিবে বলেছিল।"[১৫]

সচ্ছল ব্যক্তি ছাড়া পূজোতে ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন ছিল। দুর্গাপূজার সর্বনিম্ন কি পরিমাণ খরচ লাগত তার হিসেব পাওয়া যায়নি। তবে ১৮১৬ সালের একটি খরচ খুঁজে পেয়েছি। এখানে দু'ধরনের খরচ দেওয়া আছে। তৎকালীন টাকার হিসেবে ঐ পরিমাণ টাকা কমতো নয় অনেক বেশি-

	টাকা		টাকা
"প্রতিমা	১০ -	হইতে	২০
ঐ সাজ	১০	হইতে	২৫
পূজোপকরণ বস্ত্র	১২		
ফাইল চিরণী আদি	১ ।।.		
কুশাসন	।।.		

কম্বলাসন	১		
চন্দন	।.		
মহাস্নান সামগ্রী সংগ্রহ ব্যয়	২		
প্রশান্তি বন্ধন সামগ্রী ব্যয়	১		
ঘট	।।		
ছাগবলি	৯	"	২০
মহিষ বলি	১০	"	২০
রোচনার্থে ফলমূলাদি	৫	"	১০
দেব/ দেবীর জন্য (ভোগ পরমান্ন পিষ্টক ও ভোজ্য ভোজ্যাদিতে ৩/৪ দিনে)	১৫	"	৩০
প্রত্যহ ৫০টি লোককে খাওয়ানো	৪০	"	৬০
মামুলি বস্ত্রাদি ও বাজে	২৫	"	৮০
বাদ্য ঢাক ঢোল	৫	"	১০
নৃত্যগীত	১৫	"	১৫০
পুরোহিতের দক্ষিণা	১০	"	২৫
		১৭২ ।।	৪৯২ ।।

এই শ্রেণীতে মামুলি বস্ত্রাদিতে ও লোক খাওয়ানোতে এবং পুরোহিতের দক্ষিণা ইত্যাদি আরও অধিক ধরিলে মোট ২০০ কিম্বা ২২৫ টাকাতে হয়।

এই শ্রেণীর পূজা ৫০০ টাকাতে সুন্দর রূপ হয়।"[১৬]

পরবর্তীকালে এই ব্যয় নির্বাহ করতে না পারার দরুনই পারিবারিক পূজা হ্রাস পায় এবং সর্বজনীন পূজার পথ খুলে যায়।

অধ্যাপক যতীন সরকার তাঁর স্মৃতি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন যার ইঙ্গিত অন্য কোথাও পাইনি। তিনি জানাচ্ছেন –

এ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে ব্রাহ্মণেতর মানুষদের মধ্যে এক ধরনের জাগরণ ঘটে। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অধ্যাপক সরকার সে সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, তাঁদের গ্রাম নেত্রকোণার চন্দপাড়ায় দেবেন্দ্র দাস নামে জনৈক অব্রাহ্মণ উপনয়ন ধারণ করে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন। ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে এক ঘরে করার চেষ্টা করে। দেবেন্দ্র এখন নিজেই প্রতিমা নির্মাণ করে, নিজের পৌরহিত্যে নিজ বাড়িতে পূজা শুরু করলেন এবং তার বাড়ির দুর্গাপূজা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এ রকম আরো কয়েকজন বিদ্রোহী

অব্রাহ্মণ ঐ এলাকায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ না করে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন।[১৭]

এটি বিছিন্ন একটি ঘটনা নাকি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এমনটি ঘটেছিল তা জানা যায়নি। তবে, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে যে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ করেছিলেন, তার বিভিন্ন প্রমাণ আছে। উদাহরণস্বরূপ, আদমশুমারী ও বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৪৬ সালে বাংলাদেশে, বিশেষ করে নোয়াখালীতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর থেকে অনেক অবস্থাপন্ন হিন্দু পরিবার দেশ ত্যাগ করেন। ১৯৪৭-এর পর এ ধারা বেগবান হয়। অনেক পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। সব মিলিয়ে, গ্রামাঞ্চলে এককভাবে পূজা অনুষ্ঠান করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালেই গ্রামাঞ্চলে বর্ণবিভেদ ভুলে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ একত্রিত হয়ে চাঁদা তুলে পূজার অনুষ্ঠান শুরু করেন যা এখন 'সর্বজনীন পূজা' হিসেবে পরিচিত। পুরো প্রত্যয়টিই ছিল নতুন কারণ, এর আগে এখানে এভাবে পূজা অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করা হয়নি।[১৮]

পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে যত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সব প্রায়ই সর্বজনীন দুর্গাপূজা। তা বলে ব্যক্তিক বা পারিবারিক উদ্যোগে যে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় না, তা নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকার 'ঢাকেশ্বরী মন্দির' পরিণত হয়েছে দুর্গাপূজা পালনের কেন্দ্র এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় পূজা কমিটি।

সর্বজনীন বা ব্যক্তিক যেভাবেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন পূজা, তা ধীরে ধীরে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ উৎসবে এক সময় সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষই যোগ দিতেন, এখনো দেন, তবে সে হার হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে দুর্গাকে নিয়ে আলাদা লৌকিক পুরাণই সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালী হিন্দুর কাছে দুর্গা তার নিতান্ত গাঁয়ের মেয়ে। প্রতি বছর তিনদিনের জন্য বাপের বাড়িতে নাইয়র আসেন ছেলে মেয়েদের নিয়ে। এ বিষয়ে তাই রচিত হয়েছে অনেক 'আগমনী' ও বিজয়ার গান।

এ দিকটির ওপর যদি আমরা গুরুত্ব আরোপ করি, তাহলে দেখবো, পৃথিবীর অন্যান্য আরো অনেক ধর্মীয় উৎসবের মতো দুর্গাপূজা নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে শুরু হয়নি। বাংলাদেশের অন্যান্য উৎসব ঈদ, মুহররমের মতো এর আদি মূল ও

প্রোথিত ফসল ও মাটিতে। এস.বি. দাশগুপ্ত এদিকে দৃষ্টিআকর্ষণ করে লিখেছেন, "ফসল তোলার সময় ও দুর্গাপূজা শুরুর সময়টা প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ দুর্গা জড়িত ফসল, মাটি, 'ফার্টিলিটি ও প্রসপারিটি'র সঙ্গে, তাই সময়ের এই মিল। শরৎ-এর ফসল তোলার সময় যাকে আরাধনা করা হতো বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তিনিই পরিণত হয়েছেন দুর্গায়। সে কারণেই, এ পূজায় ব্যবহৃত হয় বিল্বপত্র, নব পত্রিকা ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, দেবী দুর্গা পূজিত 'অন্নপূর্ণা' বা 'অন্নদা' হিসেবেও এবং দুর্গাপূজার পরই অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপূজা যিনি ফসল তোলা ও ভাগ্যের দেবী।"[১৯]

এ পরিপ্রেক্ষিতে সবশেষে উল্লেখ করব দুর্গামূর্তি নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে। রমাপ্রসাদ চন্দ প্রাচীন ও বর্তমান দুর্গা মূর্তির মধ্যে তফাৎ লক্ষ্য করেছেন। প্রাচীন মূর্তিতে, দেবীর বাহন সিংহ ও মহিষাসুর প্রায় নিহত। কিন্তু, এখন দেবী যুদ্ধ করছেন মহিষাসুরের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গে আছেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পুরান বা উপপুরানেও নেই যে, দেবী যখন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে রত, তখন কার্তিক, গণেশ সেখানে ছিলেন। তার মতে, "প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে এখন দুর্গার যে মূর্তি পূজিত হয় তাহা মহিষাসুর নিধনে নিরতা রণচন্ডিকার মূর্তি নহে। বৎসরান্তে মাতা মেনকার এবং পিতা হিমালয়ের গৃহে পুত্র কন্যাসহ আগত উমার পূজা। সংস্কৃতি বা উপপুরানে এই পূজার বিধি নাই। বাংলা ভাষায় রচিত দুর্গামঙ্গল কাব্যগুলি এই পূজার শাস্ত্র।"[২০]

এরকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন শম্ভুচন্দ্র দেও। উনিশ শতকে সিলেটে দুর্গা মূর্তির কথা উল্লেখ করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন, 'অন্যখানে দুর্গার মাথায় অলংকৃত যে মুকুট থাকে এখানে দশটির মধ্যে ন'টি মূর্তিতেই তা থাকে না। কয়েক বছর আগে নাকি মাথায় আদৌ মুকুট পরানো হ'ত না।... শুধু তাই নয়, কার্তিক বা গণেশ ও দুর্গা মূর্তির সঙ্গে থাকেন না।... [২১]

চন্দ এই বিভ্রাটের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "... শাস্ত্র সম্মত পূজা পদ্ধতিতে মহিষমর্দিনীর ধ্যানোনুসারেই মূল মূর্তি গঠিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশের সহিত বাপের বাড়িতে আসিয়া মহিষাসুর বধ ব্যাপারটা অভিনয়ের মত দেখায়। ইহাতে ধ্যানের মহিষমর্দিনীর অবমাননা করা হয়। কিনতু একথা এ দেশে কেহই লক্ষ্য করেন না।"[২২]

তথ্যনির্দেশ

১. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ' দেবী দুর্গা', ('যমুনা'র কার্তিক অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি আবার পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে) *প্রবাসী*, ২৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
২. রমাপ্রসাদ চন্দ, *ইতিহাসে বাঙ্গালী*, কলকাতা, ১৯৮১, (প্রবন্ধের নাম ঃ দুর্গোৎসব), পৃ. ১১৯
৩. ঐ, পৃ. ১২৬
৪. ঐ, পৃ. ১২৫
৫. যোগেশচন্দ্র রায়, 'দুর্গোৎসব প্রশ্ন', *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩৫৩, পৃ. ৬৮, লিখেছেন তিনি, "পূর্ববঙ্গে এক বিস্ময়কর ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। ভাগীরথীর পূর্বপার্শ্ব হইতে ত্রিপুরা মৈমনসিংহ পর্যন্ত শন পুষ্পীর নাম আতশী হইয়া গিয়াছে।" ঐ, মাঘ, ১৩৫৩, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪
৬. প্রবর্তক, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩২, পৃ. ৩৮১
৭. অধ্যাপক যতীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা

"দুর্গাপূজার বিধি সাতটি। প্রথমত ভাদ্র কৃষ্ণ নবমী যেদিন বোধন করা হয় দেবীর, সেদিন থেকে ষোলদিন চলে পূজা। দ্বিতীয়ত আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ। দ্বিতীয়া কেশবন্ধনের পদডোর, তৃতীয়ায় পদরঞ্জনের জন্য অলক্তক, ললাটের জন্য সিন্দুর, মুখ দর্শনের জন্য দর্পণ, চতুর্থীতে মধুপর্ক, নেত্রের কজ্জল, পঞ্চমীতে সগুরু চন্দন প্রভৃতি অঙ্গরাগ দ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয়। তৃতীয়ত আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠী। ঐদিন সন্ধ্যায় দেবীর বোধন ও অধিবাস। চতুর্থত ষষ্ঠী পর্যন্ত ঘটে পূজা। সপ্তমী থেকে প্রতিমা পূজা, পঞ্চম শুক্ল অষ্টমী ও নবমী- দু'দিন পূজা, ষষ্ঠ বা শুধু অষ্টমীতে পূজা করেই বিসর্জন, সপ্তম শুক্ল নবমী। সেদিন পূজা ও বিসর্জন। দশমীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফেরা।"

যোগেশ চন্দ্র রায়, *প্রাগুক্ত*, ফাল্গুন, ১৩৫৩, পৃ. ১৪৫

৮. ভবতোষ দত্ত, *আট দশক*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮
৯. মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*, ঢাকা, ১৯
১০. S.C. Dey, Sylhet, Calcutta, 1880, P. 76. লিখেছেন তিনি "... though the Doorga Poojah stands out most prominent among the religious festivals of the Hindus, still it does not seem to possess so much significance in this country as the Bishohoree Poojah or the Kartikaya Poojah.... Each and all of them do not worship the Goddes Doorga in their several house as they do Bishohoree and the Kartikaya. There might be equal or even greater show of Joy on the

occasion of the Doorga Poojah: but certainly there is then manifested less religious seal than what is shown by the literally universal worship of the Bishohoree and the Kartikay". P.77.

১১. বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য, *দুর্গোৎসব*, কলকাতা, ১২৮৩; বা দেখুন, Baboo ঐরাবন চন্দ্র পক্ষীরাজ, '*দুর্গাপূজা এক বিটকেল মহাকাব্য*, কলকাতা, ১২৮৩। ভট্টাচার্য লিখেছেন, "মহামায়া গিরিসুতা দশভুজা নৌকাতেই আসুন আর ঘোড়াতেই গমন করুন, বঙ্গবাসিগণের হাতে টাকা থাকুক আর নাই থাকুক, পূজার মরসুম কোন কালেই মন্দা হয় না। বামুন, গোঁসাই, কামার, কুমার, পোটো, ডাকওয়ালী, মুচী, কাপড়ওয়ালা, সেকরা, মুনি, ময়রা, আতর গোলাম, মালা, মুদি, মাতাংগাওয়ালা, যাত্রার দল, তয়ফা ওয়ালি, জামাই, পাইট কাটা, চোর, জুয়াচোর, সরকার, পেয়াদা প্রভৃতি সকলেই এই সময় দশটাকা উপার্জন করিয়া থাকে। বড় বড় ইংরাজ সওদাগরেরাও মহামায়ার কৃপায় এ সময় বেশ দশটাকা লাভ করেন। এ সময় কেহই নিরানন্দে থাকেন না, সকলে মিলিয়া আনন্দে করতালী দেন। মহামায়ার শুভ আগমনে যে কেবল হিন্দুরা আহলাদে ফুটিফাটা হন তা নয়, ইংরাজ ফিরিঙ্গিরাও এ সময়ে আমোদ করিতে ছাড়েন না। মহৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে এই একটা বিশেষ সময়।' পৃ. ১।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Wilkins, Hindu Feasts, Feasts and Ceremonies যার সংক্ষিপ্ত রূপ উদ্ধৃত হয়েছে Iohn Murdoch, Hindu and Muhammadan Festivals Compiled from Wilson, Wilkins, crooke, sell, hughes and other Writers, London, 1904 মার্ডিক, ১৮৮৭ সালের ইন্ডিয়ান ম্যাসেঞ্জার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন-

"There are not now the grand entertainments at the Durga Puja as in former times. One of the chief features at present is the stock of wines and spirits provided by shopkeepers."

১২. কৃষ্ণ কুমার মিত্র, *আত্মচরিত*, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ. ২৯-৩১; বা দেখুন, গোপাল হালদার, *রূপনারানের কূলে*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৩৩>
১৩. মনোমোহন চক্রবর্তী, বরিশালে পয়তাল্লিশ বছর, *ব্রহ্মবাদী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, পৃ. ৪১ বিবরণটি আমাকে পাঠিয়েছেন- শ্রী অমল শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪. অধ্যাপক যতীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা
১৫. ভবতোষ দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪, ৪৭
১৬. মদনমোহন শার্মা চৌধুরী, আয়োজন কুড়িগ্রাম, ১৮৯৬ পৃ. ৯৫
১৭. অধ্যাপক যতীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা
১৮. অধ্যাপক যতীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা
১৯. S.B. Dasgupta, *Aspects of Indian Religious Thought*, Calcutta, 1957, P. 50. তিনি লিখেছেনঃ

"In the autumnal worship of the goddess her first representative in the branch of the 'bilva' tree in which the goodess is to be first awakened. In the next stage the representative of the goddess in the 'Navapatrika' hymns are uttered in praise of all plants and herbs.

Mother has often been identified in her worship with rice ('dhanya-rupa'), the staple food of a substantial portion of the Indian subcontinent. An epithet of Durga is 'Sakambhari' which means the herb-nourishing goddess. She is worshipped also as ' annapurna' or 'Annada' both meaning the goddess of food উদ্ধৃত, Sremati Chakrabarti, 'Worship of Durga: From Myth and Texts', Link. 8.3.1992 (New Delhi).

২০ রমা প্রসাদ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২১. S.C.Dey, op. cit. 1970.

২২. রমা প্রসাদ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

নববর্ষ

নববর্ষ প্রতিটি দেশেই কোন না কোন ভাবে পালিত হয়। পাশ্চাত্যে, খৃষ্টান জগতে পহেলা জানুয়ারি পালিত হয় নববর্ষ। বর্তমানে পহেলা জানুয়ারি নববর্ষ পালন অনেকটা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, শুধু পাশ্চাত্যে নয়, প্রাচ্যেও। এমনকি আমাদের দেশের এলিট শ্রেণীও পহেলা জানুয়ারি পালন করে নববর্ষ। সম্প্রদায়গত ভাবে, মুসলমানদের নববর্ষ মুহররমের আশুরা থেকে। ইহুদীদের নববর্ষের নাম' রাশ হাসানা, ইরানীদের নববর্ষ 'নওরোজ' যা মুঘলরা চালু করেছিলেন ভারতবর্ষে। 'তেত' হচ্ছে ভিয়েতনামীদের।

নববর্ষ পালনের মূলে আছে কৃষি। আগে বছর গণনার ভিত্তি ছিল চন্দ্রকলা। পরে ফসল বোনা ও কাটার বা কৃষির কারণে চন্দ্র ও সূর্য বা 'চান্দ্র সৌর বৎসর ভিত্তিক' গণনা শুরু হয়। লিখেছেন এনামুল হক, নববর্ষ বিষয়ক তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে, "গোড়ায় নববর্ষ ছিল মানুষের 'আর্তিব উৎসব' বা ঋতুধর্মী উৎসব। ঋতুধর্মী বলে কৃষির সাথেও এর সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ, কৃষি কাজ একটি ঋতুনির্ভর মানব বিজ্ঞান।"[১] প্রকৃতির কাছে নতি স্বীকার নয়, ঋতুর পরিবর্তন দেখেই পালিত হতে থাকে নববর্ষ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির নববর্ষের মূল বৈশিষ্ট্য স্বতস্ফূর্ত আনন্দ। হ্যাঁ, পাশ্চাত্যে খৃষ্টানরা নববর্ষের দিন গীর্জায় প্রার্থনা করেন বটে, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটার পর থেকে মেতে ওঠেন আনন্দে। প্রাচ্যে, চীনা, জাপানী, ভিয়েতনামীদের নববর্ষও আনন্দের। ইরানে নওরোজ পালিত হয় প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে। এনামুল হক লিখেছেন— 'আগেকার ঋতু পরিবর্তনকালীন স্বতস্ফূর্ত নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ ও পানাহার জোরেসোরেই চালু রইল বটে,তবে তার সাথে যে নতুন উদ্যোগ যুক্ত হ'ল তাকে বলা যায় বিশ্বাস- অনুশাসিত অনুষ্ঠান।'[২]

এর উদাহরণ মুসলমানরা। তাদের নববর্ষের শুরু আশুরার বিষাদ নিয়ে। এক্ষেত্রেও মুসলমানরা ব্যতিক্রম। কারণ, পৃথিবীর কোন দেশের বা জাতির নববর্ষ শুরু বিষাদ দিয়ে নয়। হয়ত নিয়তিবাদের প্রভাব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মক্কা, মদীনা যখন পারস্যের প্রদেশ হিসেবে গণ্য, তখন সেখানেও পালিত হ'ত

নববর্ষ। হজরত (দঃ) মদিনায় হিজরতের দু'বছর পর নওরোজ বাদ দিয়ে প্রবর্তন করেন ঈদ উৎসব।

আগেই উল্লেখ করেছি, মুঘলরা পারস্যের নওরোজ প্রবর্তন করেছিলেন যার প্রধান অঙ্গ ছিল মীনাবাজার। এ মীনা বাজারেই নূরজাহানকে দেখে প্রেমে পড়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। পাকিস্তানী আমলেও এ অঞ্চলে চালু করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিলো মীনা বাজারের, কিন্তু তেমনভাবে তা সফল হয় নি। বাংলাদেশে ষাট দশকে সবকিছু ছাপিয়ে উঠে এসেছে বাংলা নববর্ষ ও তার অনুষঙ্গ হিসেবে মেলা।

আমরা জানি যে, বাংলা সনের প্রথম দিন বাংলাদেশে পালিত হয় নববর্ষ হিসেবে। 'নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের প্রথম দিন', যেমন লিখেছেন এনামুল হক, 'প্রকৃতপক্ষে তা একটা নির্দিষ্ট উৎসবের দিন।'[৩]

বাংলা নববর্ষ এমন একটি দিন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এটি হিন্দু বা মুসলমান বা বৌদ্ধের একক কোন উৎসবের দিন নয়। এটির চরিত্র সর্বজনীন। আসলে, ধর্মভিত্তিক নয় কিন্তু সর্বজনীন এমন উৎসব পৃথিবীতে বিরল। এই সর্বজনীনতার রূপ এনামুল হক প্রত্যক্ষ করেছেন মেঘের জন্য সমবেত প্রার্থনাতে। বৈশাখের তপ্ত দিনে পুরুষ মহিলারা যখন মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে বা 'মেঘের কাছ থেকে জল ভিক্ষা করাও বাংলা নববর্ষের আর একটা সার্বজনীন অনুষ্ঠান।'[৪]

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। কিন্তু, তাদের নববর্ষ আশুরা থেকে শুরু নয় এবং তা বিষাদময়ও নয়। এ কারণেও বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ পালন বিশেষ স্বাতন্ত্র্যময়।

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। খুব সম্ভব বাংলা সনের সঙ্গে যোগ আছে বাংলা নববর্ষ পালনের। সম্রাট আকবর বাংলায় বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন ১০ মার্চ, ১৫৮৫ সালে, কিন্তু তা কার্যকর হয় ১৬মার্চ ১৫৫৬ সালে, তাঁর সিংহাসনারোহনের সময় থেকে। বাংলা সনের ভিত্তি হিজরী চান্দ্রসন ও বাংলা সৌরসন। বাংলার তৃণমূল পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিলো বাংলা সন। এর একটি কারণ হতে পারে এই যে, বাংলা সনের ভিত্তি কৃষি এবং বাংলা সনের শুরুর সময়টা কৃষকের খাজনা আদায়ের। যেমন, চৈত্রে বৃষ্টি হলেও কিন্তু কৃষক লাঙ্গল দেয় না খেতে, লাঙ্গল দেয়া হয় সাধারণত বৈশাখে, বৃষ্টির কামনাও সেজন্য। অবশ্য, চৈত্রে বৃষ্টি হলেও লাঙ্গল দেয়া হয়।

তবে, যাই হোক, এখনও সাধারণ মানুষ তাঁর নিত্যকর্ম সম্পাদন করেন বাংলা সনের নিরিখে। আর শহরবাসীরা জুলিয়াস ক্যালেন্ডারের নিরিখে। শাসসুজ্জামান খান

যথার্থই মন্তব্য করেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে যে, আকবর একসময় সর্বভারতীয় ইসলামী সন ও বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন। 'কিন্তু একটি সময়ে প্রবর্তিত বাংলা সন শুধু টিকেই থাকেনি বরং বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত যৌথ প্রধান বাঙালী সমাজকে দিয়েছে জাতীয় চেতনা এবং গৌরববোধের এক বিশেষ শক্তি।'[৫]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একেক ঋতুতে নববর্ষ শুরু হয়। বাংলা নববর্ষ গ্রীষ্মে। গ্রীষ্ম তো খুব মনোরম মাস নয় বাংলাদেশে, উৎসব ও আনন্দও তেমন হতে পারে না তখন, যেমন হতে পারে শীত বা বসন্তের শুরুতে। অনেকের মতে, বাংলা নববর্ষ তো আসলেই অগ্রহায়ণেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, কৃষির দিক বিবেচনা করলেও। যেমন, অগ্রহায়ণ ফসল কাটার মাস। কিন্তু, হচ্ছে বৈশাখে। পল্লব সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'হয় হেমন্তে, নয় বসন্তে অর্থাৎ শস্য এবং ফুল-ফল যখন নতুন করে জন্মাতে শুরু করে, তখন থেকেই নতুন বছরের হিসাব ধরা। এটিই ছিল প্রাথমিক রেওয়াজ। পরে নানান ব্যবহারিক প্রয়োজনে সেটি অন্যান্য ঋতুতে সরে গেছে কালের বিবর্তনে। পয়লা জানুয়ারি বা পয়লা বৈশাখ থেকে বছর আরম্ভ করা রেওয়াজ তাই অনেক অর্বাচীন।'[৬]

কিন্তু সেই রহস্য উদঘাটিত হয় নি। আমাদের দেশতো গ্রীষ্মমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত তাই গ্রীষ্মেরই প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক। তা'ছাড়া, এমনকি হতে পারে যে, ঐ সময় খালবিল নদীনালা সব শুকিয়ে যায়, চারদিকে শুধু পানির তৃষ্ণার, সবকিছু মিলিয়ে ঋতুর এক প্রচন্ড পরিবর্তন সহজেই স্পষ্ট হয়। তারপর কালবোশেখী। আচমকা বুনো মোষের মতো এসে সব করে দেয় লন্ডভন্ড। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। কমে দাবদাহ। হাল পড়ে খেতে। সব মিলিয়ে প্রকৃতি প্রভাবিত করেছে বৈশাখে নববর্ষ নির্ণয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন লিখেছেন–

এসো হে বৈশাখ এসো এসো
তাপস নিশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে

এনামুল হকও তাই মনে করেন। 'যেখানে যে ঋতু প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে সে ঋতুকেই কেন্দ্র করে প্রধান উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। তদুপরি ছোটখাট, আর্তব উৎসব তো নিয়মিতভাবে চলতই। এ বিষয়ে বাংলার স্থান নিয়ে স্বতন্ত্র ছিল। তার প্রধান 'আর্তব উৎসব' যে গ্রীষ্মকালে ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর সর্বত্র যেমন প্রধান 'আর্তব উৎসব নববর্ষের উৎসব রূপে পরিগণিত হয়েছে, আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালীন প্রধান উৎসবও নববর্ষের উৎসব রূপে পরিগণিত হয়ে থাকবে,

আমার মনে হয়, কাল- বৈশাখীর তান্ডব লীলা ও তার পরে পরেই প্রকৃতির নতুন সৃষ্টির যে রূপটি বাংলাদেশে দেখা দিয়ে থাকে, তাই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে গ্রীষ্মকালের এবং গ্রীষ্মকালীন উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছিল। নইলে, এখানকার নববর্ষের অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি ধর্মের প্রভাবে বিপুলভাবে প্রভাবিত হ'ত। কেননা, আমাদের দেশ আদিম অধিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশ। অথচ এ সমস্ত ধর্মের কোন বিশিষ্ট প্রভাব আমাদের 'নববর্ষের অনুষ্ঠানে ও উৎসবে দেখা যায় না।'[৭]

গত চারশো বছরে অর্থাৎ আকবরের বাংলা সন প্রবর্তনের পর হয়ত কৃষি ও ঋতুর সঙ্গে যুক্ত অনেক অনুষ্ঠান এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এবং এভাবে আবর্তিত হয়ে পহেলা বৈশাখ রূপান্তরিত হয় নববর্ষে। এখানে এনামুল হক বাংলা নববর্ষের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে যোগ করতে পারি যে, বর্তমান শতকে ষাটের দশক থেকে বাংলা নববর্ষ এক নতুন রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করেছে। আর কোন দেশে কোন ঋতু এরকম রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করেছে বলে জানা নেই।

বাংলাদেশে নববর্ষের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলো এবং হয়েছে নানা আনুষঙ্গিক বিষয়। এর কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু আবার বিশেষ কিছু অঞ্চলেই প্রচলিত।

প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে এ রকম একটি অনুষ্ঠান পুণ্যাহ। এর উদ্ভব কবে সে সম্পর্কে জানা যায় না, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তির পূর্বপর্যন্ত তা ছিল। পুণ্যাহ যুক্ত ছিল নববর্ষের সঙ্গে। ঐ দিন প্রজারা ভালো পোশাক আশাক পরে জমিদারীর কাছারীতে যেতেন খাজনা- নজরানা দিতে, যেন পুণ্য কাজ করতে যাচ্ছেন। পুণ্য থেকেই পুণ্যাহ।

হালখাতা অবশ্য এখনও অটুট। প্রধানত ব্যবসায়ী মহল এটি পালন করে। নববর্ষের দিন, ব্যবসায়ীরা পুরনো বছরের হিসেব-নিকেশ সারে। এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে লাল কাপড়ের মলাটের এক বিশেষ খাতা ব্যবহার করে, যাকে খেরো খাতা বলা হয়। সেদিন দোকানে কেউ গেলেই মিষ্টি খাওয়ানো হয়। শুধু তাই নয়, ঢাকা শহরের অনেক মধ্যবিত্ত আজকাল নববর্ষ উপলক্ষে মিষ্টি কেনেন, ভালো খাবারের আয়োজন করেন।

আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখ্য, চাঁটগা শহরের জব্বারের 'বলী খেলা' বা কুস্তি। এটি এখনও প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে চাঁটগা শহরে। রাজশাহীর

গম্ভীরাও এমনি একটি অনুষ্ঠান। ঢাকার মুন্সীগঞ্জে প্রচলিত ছিল গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা।[৮]

তবে বৈশাখ এবং পহেলা বৈশাখের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান মেলা। আমাদের দেশের 'নববর্ষের' মেলাগুলোও এদেশের প্রাচীনতম 'আর্তব উৎসব' ও 'কৃষ্যুৎসব' প্রভৃতির বিবর্তিত রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, এগুলোতে এখন পর্যন্ত স্থানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির বেচা কেনা হয়।[৯] বৈশাখী মেলার আরো একটি বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাহলো অন্যান্য মেলায় ধর্মের উপাদান প্রবেশ করলেও বাংলা দেশের মেলায় তা করেনি। এখনও তা কুটিরজাত পণ্যাদির বেচাকেনার মেলা। এক হিসেবে জানা গেছে, সারা বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখে এবং বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে প্রায় দু'শো মেলা অনুষ্ঠিত হয়।[১০] ঢাকা শহরের বা শহরাঞ্চলে আয়োজিত মেলায় মাটির ও কুটিরজাত পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ মেলারও আয়োজন করা হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান নববর্ষের শুভেচ্ছা হিসেবে মক্কেলদের উপহার হিসেবে প্রেরণ করছে বই।

বাংলাদেশে, আগেই উল্লেখ করেছি, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি উপাদান হিসেবে পহেলা বৈশাখ পালন শুরু হয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে তা নতুন মাত্রা যোগ করে। আইয়ুব আমলে, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও বাঙালী সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ শুরু হলে, ছায়ানট ১ লা বৈশাখে নববর্ষ পালন উপলক্ষে রমনার বটমূলে আয়োজন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের। গোঁড়া ধর্মবাদের বিরুদ্ধে ছিল তা প্রতিবাদ। ছায়ানটের এই প্রচেষ্টা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠীর আদর্শের প্রতিবাদে ঘটা করে বাংলা নববর্ষ পালিত হতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বাংলা নববর্ষ ঘোষিত হয় সরকারি ছুটির দিন হিসেবে। এভাবে তৃণমূল পর্যায়ের নববর্ষ পালনের সঙ্গে যুক্ত হয় শাহরিক প্রচেষ্টা। যে কারণে, ধর্মীয় উৎসব ছাড়া, বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখের উৎসব একমাত্র অনুষ্ঠান যার বিরুদ্ধে মৌলবাদীরা কোন কটাক্ষ করার সাহস করেনি, যা তারা করে একুশে ফেব্রুয়ারি বা বিজয় দিবস উপলক্ষেও।

সবশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে, একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠান বাংলা নববর্ষ। তৃণমূল থেকে শাহরিক- সব পর্যায়েই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তা পালিত হয় একমাত্র খাঁটি বাঙালী উৎসব হিসেবে। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, মুসলিম অধ্যুষিত একটি ভূখন্ডের উৎসব সত্ত্বেও তা বিষাদময় নয়; রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল হলেও এক্ষেত্রে পারেনি ধর্মজ উপাদান যোগ করতে। শুধু তাই নয়, এখনও এ নববর্ষ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও যোগ করে নতুন মাত্রা। আপনাদের কি মনে

পড়ে, সামরিক শাসনমলের প্রতিটি নববর্ষের অনুষ্ঠানে কি বিপুল পরিমাণ মানুষ সমবেত হ'ত। নববর্ষে যারা শুধু ঘরে বসে ছুটি ভোগ করতে চান, তারাও কি প্রেরণায় সে সময় যোগ দিতেন এ উৎসবে? এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য মিলে বাংলা নববর্ষকে আখ্যায়িত করতে পারি, পৃথিবীর এক বিরল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসব হিসেবে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ এনামুল হক, 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ' *মনীষা মঞ্জুষা*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬
২. ঐ, পৃ. ১৭
৩. ঐ, পৃ. ১
৪. ঐ, পৃ. ৩
৫. শামসুজ্জামান খান, 'বাংলা সন ও তার ঐতিহ্যানুসন্ধান' এমদাদুল ইসলাম সম্পাদিত, *বৈশাখী*, ঢাকা, ১৩৯৯, পৃ. ১৮
৬. পল্লব সেনগুপ্ত, 'নববর্ষ, হালখাতা এবং গণেশ পূজা' উৎস ও উৎসব,' পূজা পার্বনের উৎসব, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬৮-৬৯
৭. এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০
৮. আঞ্চলিক উৎসব বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।
৯. ঐ, পৃ. ২০-২১
১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত, *বাংলাদেশের মেলা*, ঢাকা

পরিশিষ্ট-১

জন্মাষ্টমীর সঙের গান

গান
মা তোমার কি অপার লীলা,
ঢাকায় বসন্তের খেলা।
বুড়িগঙ্গার চরে নিলা,
হাসপাতালের ঘর।
বসন্ত আর ঝিন-ঝি বাতে,
লোক মরেছে শতে শতে,
লালবাগ আর শ্যামপুরেতে,
চিতার নাই অবসর।।
কেহ যায় স্নান করিতে,
কেহ যায় মা বাজারেতে,
ঝিন-ঝি বাত পড়ে বসে
তাহাদের উপর।।

গান
আগে জানলে বৈরাগী হত কোন্ শালা।
ও মালা জপতে হবে,
ও মালা ঠেলতে হবে তিন বেলা,
আগে জানলে বৈরাগী হত কোন্ শালা।
হায় রে বৈরাগী হওয়া,
উঠে গেছে ভিক্ষে দেওয়া,
বোষ্টুমী পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলায়,
সব সুপারি তিন ছালা,
আগে জানলে বৈরাগী হত কোন্ শালা।।

শাশুড়ী বউ-এর ঝগড়া
শাশুড়ীঃ মোদের দিকে চাহিয়া তোমরা দেখ বাবু ভাইয়া,

পরিশিষ্ট-২

দুর্গোৎসব

পূর্বাকালে গোবিন্দপুর গ্রামে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর গৃহস্থ দুর্গোৎসব করিতেন। এখন আর সেদিন নাই, এখন বড় জোর সাত আট বাড়ী দুর্গোৎসব হয়। আগে অনেকে ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সঞ্চয়পূর্বক মহামায়াকে ঘরে আনিত; বর্তমান দুঃসময়ে ভিক্ষালব্ধ অর্থে উদর পূর্ণ হয় না, দুর্গোৎসব ত বহু দূরের কথা! সেকালের বৃদ্ধদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আগে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনেও লোকে স্বচ্ছন্দে বহু পরিবার প্রতিপালন করিয়া দোল-দুর্গোৎসব করিতে পারিত, আর একালে মাসিক এক শত টাকা আয় হইলেও খাইতেই কুলায় না কেন? উত্তরে তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন, সেকালে পাঁচ টাকা বেতনের উপর দশ টাকা উপরি ছিল; বেতনটা ত ফাউ-র সামিল, উপরি আয়ই আসল রোজগার! এই উপরি আয়টি একালে খুবই কমিয়া গিয়াছে; তাহার উপর সেকালে খাদ্যদ্রব্য সুলভ ছিল টাকায় ষোল সের তেল, আট সের ঘি মিলিত, দু' টাকার ধান কিনিলে খুব বড় গৃহস্থেরও মাসখানেক কোন চিন্তাই থাকিত না; এক এক গৃহস্থের গোয়ালে যতগুলি গরু থাকিত, তাহাতে প্রতিদিন সকালে আধ মণ ত্রিশ সের দুধের সংস্থান হইত; বিশেষত, সেকালে বিলাসলালসা এরূপ প্রবল হয় নাই, বিলাসের প্রলোভনও অল্প ছিল; সুতরাং সেকালে সহজেই দুর্গোৎসবের আয়োজন হইত। পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিলে সেকালে যেমন পূজা হইত, একালে পাঁচ শত টাকা খরচ করিলেও তেমনটি হইবার উপায় নাই!

যাহা হউক, ঠিক এই কারণে কি না জানি না, গোবিন্দপুরে দুর্গোৎসবের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু সংখ্যায় কমিলেও ধুমধাম যে অনেক বাড়িয়াছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজকাল জনমেজয় ভট্টাচার্য গোবিন্দপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। গোবিন্দপুরের লোকে বলে, "রাজা-রাজড়ার বাড়িতেও এমন ধুমধামে মহামায়ার পূজা হয় না; কেমন ঢাকের বাদ্য, কেমন রোশনাই, প্রতিমা সাজাইবারই বা কারিকুরি কত!"-ইংরাজী লেখাপড়া না শিখিয়াও জনমেজয়ের বড় পদ-পসার; উকীল মোক্তার ও আমলা মহলে তাঁহার যৎপরোনাস্তি খাতির। জনমেজয়ের মান সম্ভ্রম ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি গোবিন্দপুরের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, এমন কি,

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণেরও অপরিহার্য আলোচনার বিষয়। জনমেজয়ের মত সম্পদ ও খ্যাতি লাভ করা গোবিন্দপুরের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা বালকগণের শৈশবস্বপ্ন, সম্ভ্রমীয় যুবকগণের চিরপোষিত কামনা।

জনমেজয়ের অবস্থা প্রথমে সচ্ছল ছিল না। পাঠশালায় বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া কিছুদিন তিনি কোন জমিদারের সেরেস্তায় গোমস্তাগিরি, মুহুরীগিরি বা ঐ রকমের কি একটা চাকরী করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রবল উচ্চাভিলাষ তাঁহার সহায় ছিল। কয়েক বৎসর জমিদারীর কাজ শিখিয়া শেষে তিনি খয়রামারীর নীলকুঠিতে ছোট দেওয়ানের পদ লাভ করেন। তাহার কিছু দিন পূর্বে বঙ্গদেশে নীলবিদ্রোহ হইয়া গিয়াছিল। জনমেজয় নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও চাতুর্যের সহায়তায় সাহেব-জমিদারগণের মনস্তুষ্টিসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাহার ফলে এখন তিনি জন স্টুয়ার্ট কোম্পানীর সুবিস্তীর্ণ 'কাণ্ সারণে'র বড় দেওয়ান।

বড় দেওয়ানের গৌরবান্বিত পদ লাভের পর আজ কয়েক বৎসর হইতে দেওয়ানজী মহাধুমধামে মহামায়ার পূজা করিতেছেন। প্রথম দুই এক বৎসর তিনি উৎসবের শোভাবর্ধনের জন্য গ্রামস্থ জমিদারবাড়ি হইতে ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরি প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু একবার পল্লীগ্রামের দলাদলিতে তিনি চৌধুরী জমিদারদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া নিজেই একদলের দলপতিত্ব গ্রহণ করেন এই জন্য জমিদারেরা সেইবার তাঁহাকে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া সাহায্য করিতে অসম্মত হয়; ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া এত ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, মূল্যবান ল্যাম্প, রৌপ্যখচিত অসাসোঁটা, থাস, নিশান প্রভৃতি নানাবিধ 'ইষ্টাট' আনাইয়া ফেলিলেন যে, তাহা দেখিয়া গোবিন্দপুরের আবালবৃদ্ধ সকলের 'তাক লাগিয়া' গেল। সকলেই বুঝিল, জনমেজয় দেওয়ানের চাকরীর মত চাকরী এ দুনিয়ায় অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে! গ্রাম্য রমণীগণ বলাবলি করিতে লাগিল, বিস্তর তপস্যার ফলেই তাঁহার পত্নী এমন কুবেরতুল্য ভাগ্যবান পতিরত্ন লাভ করিয়াছেন!

কিন্তু জনমেজয়ের রাজার সংসারে একটি রত্নের অভাব ছিল; তিনি অপুত্রক। স্ত্রী কন্যা ভিন্ন সংসারে আর কেহই নাই। পুত্রলাভার্থ তাহার বাড়িতে অনেক পূজা হোম যাগ ও প্রচুর ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় নাই। সুতরাং পুন্নামনরকের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার যাহা কিছু উপার্জন হইবে, তাহা তিনি দেবসেবাতেই ব্যয় করিবেন।

তদনুসারে তিনি 'বারো মাসে তের পার্বণ' আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে সঞ্চিত ধন ক্ষয় হওয়া দূরের কথা, ঐশ্বর্য দিন দিন উথলিয়া উঠিতেছে। তবে মন্দ লোকের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা বলেন, জনমেজয় দেওয়ান পুণ্য সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে দেবপূজায় অর্থ ব্যয় করেন না, ইহা তাঁহার একটি ব্যবসায়বিশেষ! দুর্গোৎসবে এত ধুমধাম, এত খরচ-পত্র; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধী ও তাঁহার পত্নী হারাণী দেবীর স্ত্রীধন সম্পত্তির নায়েব শ্রীযুক্ত কুড়োরাম চক্রবর্তী মহাশয় পীতাম্বর বেণের দোকানে অম্বুরী তামাক টানিতে টানিতে একদিন গল্প করিতেছিলেন, মহামায়াকে আনিয়া দেওয়ানজীর মবলগ টাকার সংস্থান হয়। দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনি ইষ্টার্ট কোম্পানীর ছোট বড় সকল কর্মচারীকেই নিমন্ত্রণ করেন। তাহাদের প্রণামী বাঁধা আছে; নায়েব ছোট দেওয়ানেরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা, গোমস্তা তহশিলদার খাঞ্জাঞ্চী প্রভৃতি মধ্য শ্রেণীর কর্মচারীগণ পঁচিশ টাকা, মুহুরী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা দশ টাকা হিসাবে প্রণামী দেয়। ষষ্ঠীর দিন হইতেই প্রণামীর স্রোত বহিতে থাকে! তদিতন্ন, দই ক্ষীর, বড় বড় মাছ, পাঁঠা, ফলফুলারী, কলাপাতা, ঘোড়, মোচা প্রভৃতির ত কথাই নাই। পূজার দুই তিন দিন পূর্ব হইতে বিভিন্ন স্থানের নায়েব দেওয়ানের প্রেরিত ভেট নৌকা- বোঝাই হইয়া আসিতে থাকে। অনেকেই বড় দেওয়ানজীর প্রসাদ, সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার প্রসাদ লাভের প্রত্যাশায় পূজার কয় দিন মহানন্দে তাঁহার বাড়িতে খাটিয়া দিয়া যায়। মৌখিক শিষ্টালাপে দেওয়ানজী মহাশয় অতি অমায়িক; নিমন্ত্রিত নায়েব প্রভৃতি কর্মচারী তাঁহার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলে, তিনি পরমসমাদরে তাহাদিগকে আহবান করিয়া স্মিতমুখে বলেন, "ভায়া হে, নিতান্তই যে নিমন্ত্রণ রাখতে এলে! দু' দিন আগে আসতে হয়; তোমাদের ভরসাতেই এত বড় ব্যাপারে হাত দিয়াছি, দেখো যেন অপ্রতিভ না হই। এ তোমাদেরই নিজের বাড়ি; খাট, খাটাও, খাও, খাওয়াও, আমি একা মানুষ, দেখচো তো?" -শুনিয়া নিমন্ত্রিত নায়েব গোমস্তারা পরম পরিতুষ্ট হয় এবং কোমরে গামছা বাঁধিয়া বিভিন্ন কার্যভার গ্রহণ করে।

নীলকুঠী ছাড়া জন ইষ্টার্ট কোম্পানীর জমিদারীও বহুদূর বিস্তৃত। জমিদারীর যে সকল কর্মচারী দেওয়ানজী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগ দিতে না পারে, তাহারা মণিঅর্ডার যোগে প্রণামী পাঠাইয়া দেয়। পূজার কয়দিন গোবিন্দপুরের ক্ষুদ্র ডাকঘরে যত মণিঅর্ডার আসে, তাহার পৌনে ষোল আনাই দেওয়ানজীর নামে! পূজা শেষ হয়, উৎসবের দীপ নিবিয়া যায়, বাদ্যকরেরা বিদায় লয়, তখনও মণিঅর্ডারের বিরাম নাই। তখনও আস্তাকুড়-নিক্ষিপ্ত রাশিকৃত উচ্ছিষ্ট কলাপাতার উপর কুকুরের কোলাহল, দীঘির ঘাটে তরকারিলিপ্ত স্তূপাকার যজ্ঞি'র বাসন মাজিতে গিয়া পরিচারিকাগণের কোলাহল ও বায়সকুলের কলরব, ছাদের উপর 'দামোদর

ঘোষ-শুকা দশ সের,' 'গোবর্ধন ঘোষ-রাশি বারো সের' ইত্যাদি দধির মার্কাযুক্ত শূন্যগর্ভ হাঁড়ির গড়াগড়ি ত আছেই, দেওয়ানজীর নবনির্মিত বৈঠকখানাতেও তখনও দরবারের বিরাম নাই! ময়রা, গোয়ালা, চাউল ঘৃত ময়দা সরবরাহকারী মুদী প্রভৃতি পাওনাদারেরা প্রাপ্য টাকার আশায় হা করিয়া বসিয়া আছে। সকলেরই মুখ মলিন; কারণ তাহারা জানে, দেওয়ানজী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করা, আর সাহেব জমিদারের লোভদৃষ্টিতে পতিত দলীলপত্রহীন পৈতৃক লাখেরাজ জমি দখলে রাখা, এ উভয়ই প্রায় সমান সহজসাধ্য!

কিন্তু তথাপি ভীড় কমিবে না; আশা ত আর সহজে কেহ ছাড়ে না! অগত্যা সকলে পাঁচ সাত দিন ধরিয়া যাতায়াত করে; শেষে দেওয়ানজী মহাশয়ের পারিষদরূপী উমেদার ও মোসাহেবের দল বিশেষ আড়ম্বরে সন্দেশ ও ক্ষীর-দধির দর কষিয়া, জিনিস বড় খারাপ হইয়াছিল, এই হেতুবাদে অসম্ভব রকম কম মূল্যদানের ব্যবস্থা করে; কিন্তু কাহারও কথা কহিবার যো নাই! আজ কয়েক বৎসর ইষ্টার্ট কোম্পানী গোবিন্দপুর গ্রামখানি পত্তনী লইয়াছেন। বড় দেওয়ানজী জিনিস লইয়া যে অনুগ্রহপূর্বক কিঞ্চিৎ মূল্য দিতেছেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের কথা; মূল্য কম হইল বলিয়া প্রকাশ্যভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে, এত বড় দুঃসাহস কাহার? অতএব চিনির দরে সন্দেশের, দুধের দরে ক্ষীরের ও তৈলের দরে ঘৃতের মূল্য পাইয়া পাওনাদারেরা চলিয়া যায়, এবং পথে যাইতে যাইতে দেওয়ানজী মহাশয়ের প্রতি ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব-সম্বন্ধের আরোপ করিয়া তদনুরূপ সম্বোধন দ্বারা মানসিক ক্ষোভ ও আক্ষেপ নিবারণ করে।

পূজার ছুটি হইয়াছে। প্রবাসী চাকুরিজীবীরা তৃতীয়া চতুর্থীর দিন হইতেই বাড়ি আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চারি দিকে আনন্দকোলাহল! কাহারও মেয়ে বলিতেছে, "যছি পিছি, বাবা আমাল্ দন্যে আঙ্গা কাপল এনেতে দ্যাক্!" কাহারও ছেলে বলিতেছে, "ও ব'ও দা, আমাল্ পুতুল কুতা?"-দীর্ঘ প্রবাসান্তে গৃহপ্রত্যাগত স্বামী স্নানান্তে জল খাইতে বসিয়া রসগোল্লাটি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বিরহকাতরা পত্নীকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মুখখানা যে বড় শুকনো দেখছি! ভাল ছিলে না নাকি"-পত্নী দ্বারপ্রান্তে অবনতমুখী, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিতেছেন, "মনে পড়েছে যে এই ঢের, আবার কেমন ছিলাম জিজ্ঞাসা করা কেন? নিজে বুঝি খুব ভাল ছিলে"!-ক্রমে অভিমান প্রবল হইয়া উঠিল, সারা রাত্রিতেও সেই মানিনীর অভিমান স্রোতে ভাটা পড়িল না; গৃহপ্রত্যাগত বিরহখিন্ন প্রেমিকের সমস্ত সুখ-কল্পনা রামধনুর ন্যায় তাহার নয়নসমক্ষে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল!

ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের মুখ চাহিয়া সংসার বসিয়া থাকে না। ঐ রামার মা গয়লানীর একমাত্র ছেলে রামা সেদিন কলেরায় মারা গিয়াছে। সে কুষ্টিয়ায় চাকরী করিত,-আদালতের পেয়াদা ছিল। গত বৎসর পূজার ছুটিতে রামা এতদিনে বাড়ি আসিয়াছিল, আজ ঘর অন্ধকার! তাই রামার মা ঘরের কঠিন মেঝের উপর পড়িয়া ছেলের স্মৃতি বুকে লইয়া একাকিনী আর্তনাদ করিতেছে। অভাগিনীর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই; কিন্তু কে আজ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবে?-এই আনন্দোৎসবে সকলেই আত্মসুখের সন্ধানে ব্যস্ত।

রাত্রেও কাহারও অবসর নাই। গভীর রাত্রেও পল্লীবাসিনীগণের চিঁড়া কুটিবার অশ্রান্ত ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে সমগ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাত্রি ক্রমে শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু সেই শব্দের বিরাম নাই! ষষ্ঠীর দিন হইতে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত আর ঢেঁকিতে 'পাড়' দিতে নাই, সেই জন্য রমণীগণ পূর্ব হইতেই ঢেঁকির কাজ সারিয়া রাখিতেছেন। দুর্গোৎসব ভিন্ন লক্ষ্মীপূজার দিনও সকল বাড়িতেই চিঁড়ার প্রয়োজন, সুতরাং গৃহস্থবধূরা সেই চিঁড়া এখনই কুটিয়া রাখিতেছে। যাহারা চিঁড়া বিক্রয় করিবে, তাহাদেরও সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে; কাজেই ষষ্ঠী যতই নিকটতর হইতেছে, ঢেঁকির পরিশ্রমও ততই বাড়িতেছে; তবে অঙ্গনাকুলের মধ্যে অনেকেরই অলক্তরাগরঞ্জিত সুকোমল পদ- কমল ঢেঁকির পৃষ্ঠ স্পর্শ করে, বোধ হয়, তাহাতে সে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করে; তাই বেচারার ক্লান্তি নাই! পঞ্চমীর দিন দিবারাত্রির মধ্যে মুহূর্তের জন্য একবারও তাহার বিশ্রাম ঘটে না।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রাম্যবাজারের দোকানগুলি উন্মুক্ত হইতে লাগিল। বাজারে যে তিন চারিখানি মনোহারী দোকান আছে পূজা উপলক্ষে সেই সকল দোকানে নানা রকম জিনিসের আমদানি হইয়াছে। দেশী বিলাতী ছবিতে দোকানের দেওয়ালগুলি ঢাকা; কিন্তু ছবিগুলি সাজাইয়া টাঙ্গাইবার শৃঙ্খলার সীমা নাই! এক জায়গায় কালীঘাটের এক পয়সা দামের কালো রঙ্গের পট; তাহার পাশেই হনুমান দুই হস্তে বক্ষঃ বিদারণ করিয়া দেখাইতেছে– সেখানেও রামসীতার যুগলমূর্তি অঙ্কিত আছে। তাহার পরেই একখানি আর্ট স্টুডিওর ছবি, শিবের কপাল হইতে লাল রঙ্গের ষাঁটা বাহির হইয়া মদনভস্ম করিতেছে! তৃতীয় ছবি একখানা জর্মান 'ওলিয়োগ্রাফ', যুবতী অভিমান করিয়া এক দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে, যুবকটিও প্রতিশোধ প্রদান-বাসনায় মান করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে। বিলাতী মানিনীর মানের মূল্যপরিমাপক এই চিত্রের পাশেই একখানি রঙ্গদার ছবি– বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চতুর্থ পক্ষের পত্নীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দান করিতেছে, আর ব্রাহ্মণী, মা দুর্গা

কর্তৃক অসুরের টিকি ধরিবার ভঙ্গীতে এক হাতে ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ টিকি আকর্ষণ করিয়া অন্য হাতে তাহার পৃষ্ঠে নিব্যাস্ত্র শতমুখী চালাইতেছে!

এই রকম নানাজাতীয় ছবি দিয়া দোকান-ঘরের দেওয়াল শোভিত করিয়া দোকানদার ঘরের থামে ছোট ছোট পেরেকের উপর জরিমোড়া টুপীগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছে; নানাবর্ণের নানা আকারের টুপী! চাষার দুর্গি পূজো'র সময় স্ব স্ব পুত্রের জন্য চারি গণ্ডা পয়সা ব্যয় করিয়া এক একটি এই টুপি না কিনিলে বিবির গঞ্জনায় তাহাদের গৃহ অরণ্যতুল্য দুর্গম হইয়া উঠে!

কাচের আলমারীর মধ্যে ফুলকাটা ধোয়া কামিজ, লাল সবুজ গর্ণেটের বডিস্, নানারকম এসেন্সপূর্ণ শিশি। লাল কালীতে ইংরেজী বাঙ্গালায় ছাপান লেবেল-আঁটা "মহাসৌগন্ধী" কেশতৈলের শিশি; প্রায় সকলগুলির লেবেলের উপরেই এক একটি রমণীমূর্তি– তাহাদের মাথার দিকে চাহিলে বুঝিতে পারা যায়, তৈলের আবিষ্কর্তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কেশরাশি চিত্রিত-রমণীর মস্তকে স্থাপন করিয়া স্ব স্ব তৈলের কেশোৎপাদিকা শক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্য প্রতিযোগিতা করিতেছেন।

দোকানের ঠিক মধ্যস্থলে কাচের ল্যাম্প, চিম্‌নী, কাচের গ্লাস, আয়না, ছোট বড় নানা আকারের পুতুল, কাগজে-বাঁধা ছ'গাছি করিয়া ছোট বড় লাল কাল সবুজ বেলোয়ারী চুড়ী, চীনেমাটির ডিস্, পোরসিলেনের পেয়ালা ও গ্লাস, হাড়ের 'দামাট'-ওয়ালা বড় বড় ছুরী, দুই একটা নোলক-নাড়া 'টাইমপিস্' ঘড়ি, পিতলের বিবিধ আকারের ঘট, লম্বা লম্বা বাঁশী, সাদা লাল হল্‌দে লজঞ্চুসে পরিপূর্ণ সাদা বোতল যথাক্রমে সজ্জিত। তাহাদের সম্মুখে ছোট ছোট ছুরী, কাঁচি, সাবান, কিতে, চিরুণী, মণিব্যাগ, দোয়াত, কলম, পেন্সিল, আরও কতপ্রকার সামগ্রীপূর্ণ গ্লাস্‌কেস; এক কোণে ছড়ি, ছাতা, খড়ম, কড়া, বেড়ি, বালতি প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস; আর এক দিকে লাল কালো হল্‌দে সবুজে টিনের পোর্টম্যান্টো।

সকাল বেলা হইতেই দোকানে দোকানে ক্রেতার ভীড় দেখা যাইতেছে। ছেলেরা কেহ মার্বেলের আঁটা কিনিতেছে; কেহ বাঁশীটাকেই বেশি সারবান পদার্থ ভাবিয়া তাহাই কিনিতেছে; কোন বালক লজঞ্চুসের বোতলের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, ভাবিতেছে, যদি তাহাদের বাগানে এই ফলের একটা গাছ থাকিত! প্রবাসী প্রেমিকেরা-তন্মধ্যে আদালতের আমলা ও স্কুলের মাষ্টার, পণ্ডিত প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক-প্রিয়তমার জন্য সাবান পমেটম কিনিতেছে। দোকানদার ক্রেতার আর্থিক অবস্থার কথা একবারও চিন্তা না করিয়া শুধু তাহার মানসিক আবেগমাত্র লক্ষ্য করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতেছে! কেহ নলদময়ন্তী ও রামরাজার ছবির দর করিতেছে; কোন

পিতা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাহার জন্য একটা কামিজ বা এক জোড়া মোজা কিনিবার অভিপ্রায়ে জিনিসগুলি পছন্দ করিতেছে।

মনোহারী দোকানের পরেই জুতার দোকান। বাঁশের বাখারীর শেলফের উপর সারি সারি জুতা, পুরান ছেঁড়া খবরের কাগজ দিয়া মোড়া। চারখানা ছিটের একখানি অনতিদীর্ঘ লুঙ্গী ও হাতকাটা খাট মেরজাই-পরিহিত, সাদা ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড়ে প্রস্তুত অর্ধখন্ড নারিকেলের মালার মত 'ফক্‌রে' টুপিতে আবৃতমস্তক, কপিশ-শ্মশ্রু মুসলমান দোকানদার মৌলাবকস নানাবিধ বাক্য কৌশলে ক্রেতার মন নরম করিতেছে। সামান্য-'ব্যবসা' করিতে আসিয়া সে যে 'এমন' নষ্ট করিবে না, তাহা বুঝাইবার জন্য সে 'খোদার কছম' লইতেছে এবং পয়সা অপেক্ষা 'এনাম' যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ অনেক দুর্বোধ্য আরবী ও ফারসী বয়েতের সহিত অপর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্ঠীবন বর্ষণ করিতেছে; অবশেষে চৌদ্দ আঙ্গুল লম্বা পায়ে তের আঙ্গুল জুতা 'সুহরণ'-সাহায্যে ঠেলিয়া-গুঁজিয়া পরাইয়া, পাঁচ সিকার স্থানে স-তিন টাকা দর হাঁকিতেছে এবং "সকাল বেলা বৌনির সময় এমন সরেস মাল আসল দরেই ছাড়তে হ'ল!" বলিয়া বিশিষ্ট প্রকার আক্ষেপ সহকারে জোড়ার উপর নগদ পাঁচ সিকা মাত্র লাভ রাখিয়া আড়াই টাকা বাজাইয়া লইয়া পরম গম্ভীরমুখে তাহা ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করিতেছে।

বৈকালে কাপড়ের দোকানে অত্যন্ত ভীড়। এক এক দোকানে তিন চারি জন লোক বসিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেছে, তাহাদের নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই; তথাপি 'ওহে, কতক্ষণ বসিয়ে রাখ্‌বে?' 'আমি আগে এসেছি; আমাকে আগে বিদেয় করো না কেন?' ইত্যাদি শব্দেরও বিরম নাই! পাইকেরগণ ভিন্নগ্রামে বিক্রয়ের জন্য আশি নব্বই অথবা একশত টাকার কাপড় কিনিয়া মোটা 'তেহাতে' থান দিয়া তাহা কষিয়া বাঁধিতেছে। কোন কোন গরীব লোক অনেক কষ্টে দুই একটা করিয়া কিছু পয়সা জমাইয়া তাহাই লইয়া কাপড় কিনিতে আসিয়াছে। তাহারা ক্রমাগত একখানির পর আর একখানি কাপড় দেখিতেছে, নতুন নতুন রকমের পাড় পছন্দ করিতেছে, কিন্তু ঠিক মনের মতটি মিলিতেছে না! এবং দৈবাৎ যেখানা পছন্দ হইতেছে, তাহার ভাঁজ খুলিয়া তিনবার করিয়া মাপিয়া দেখিতেছে; দোকানী তাড়া দিয়া বলিতেছে, 'তোমার একখানা কাপড় নিয়েই কি আমি সারাদিন নাড়াচাড়া করবো? নিতে হয় নাও, না হয় পথ দেখ!' কেহ পাড়ওয়ালা চাদর কিনিতেছে, কেহ নোট-মার্কা বা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিত্রাঙ্কিত রুমাল কিনিতেছে; কেহ কিছুই কিনিতেছে না, কেবল দরই করিতেছে!-পূজার বাজারে ইহারাই সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান।

এদিকে 'টহাবাজারের' মধ্যে ও রাস্তার দুই পাশে জোলারা মোটা সুতায় নানা রঙের দেশী ধুতি, শাড়ী ও পাঁচরঙা গামছার মোট খুলিয়া বিক্রয় করিতে বসিয়া গিয়াছে; তাহাদের দোকানের চারি দিকে চাষার দল বসিয়া কেহ ধুতি কেহ গামছা ক্রয় করিতেছে; কেহ বা অন্য দোকান হইতে আনীত কাপড়ের দর যাচাই করিতেছে। দরজীরা তাহাদের ছোট ছোট দোকানের দ্বারদেশে মোটা লক্কড় ও বাজে ছিটের ফতুয়া, কামিজ, মেরজাই টাঙ্গাইয়া চাষার ছেলেদের লুব্ধ চিত্তকে যৎপরোনাস্তি উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

দেওয়ানজীর বাড়ি মহাসমারোহের পূজা; তাহার তরঙ্গ ময়রার দোকানে পর্যন্ত কল্লোল তুলিয়াছে! ময়রারা ভূরিপরিমাণ সন্দেশের বায়না পাইয়াছে; কেহ উনানে ভিয়ান চড়াইয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতেছে? কেহ গোপাঙ্গনাগণের নিকট ছানা ক্রয় করিয়া 'পেছে'র মধ্যে ঢালিতেছে; কেহ ছানা ওজন করিবার জন্য তাহা গামছায় জড়াইয়া যথাসাধ্য জোরে নিংড়াইতেছে।

স্কুলের ছুটি হইয়াছে, ছেলেরা দলে দলে জুতা জামায় সজ্জিত হইয়া এক এক 'রেজিমেন্ট' শিশু কার্তিকের মত রাস্তায় রাস্তায়, বাজারের মধ্যে ঘুরিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে। চারিদিক সরগরম, আসন্ন উৎসবের একটা আনন্দময় উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে উদ্বেলিত!

পঞ্চমীর দিন প্রতিমা চিত্র করা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু 'চালি'র চিত্র এখনও শেষ হয় নাই; প্রতিমা চিত্র করা অপেক্ষা চালি চিত্র করা অধিকতর কঠিন কার্য। ছিদাম মালী প্রতিমার সম্মুখে বাঁশের 'আড়' বাঁধিয়া চালি চিত্র করিতেছে। উর্ধ্বে উন্নত অলঙ্ঘ্য ধূসর পর্বতশ্রেণী, অসমান শৃঙ্গগুলি সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত, তুষারধবল শৃঙ্গের উপর সুরঞ্জিত মেঘস্তর; এই পর্বত শ্রেণীর একটি সুপ্রশস্ত নিভৃত উপত্যকায় একখানি রম্য অট্টালিকা-সুদৃশ্য স্তম্ভশ্রেণী, পিতাভ বাতায়ন ও নীলাভ দ্বারে সুশোভিত। অট্টালিকার বহির্দেশে পত্রবহুল বিল্বদ্রুম বৃক্ষমূলে পার্বতী-সনাথ মহাদেব উপবিষ্ট পৃষ্ঠদেশে একটি অতি বৃহৎ শুভ্র 'গেন্ধা' বালিশ, পার্শদেশে ধবলকায় ষাঁড় ঘাড় বাঁকাইয়া চক্রলাঞ্ছিত নিতম্বের শোভা বিকাশ করিয়া শায়িত রহিয়াছে, তাহার মাংসবহুল কৃষ্ণাভ ঝুঁটি কাঁধের উপর ঈষৎ বঙ্কিম। অদূরে নন্দী ত্রিশূলহস্তে মুখের হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গিমা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার স্কন্ধে সিদ্ধির ঝুলি।

কৈলাসপুরীর একদিকে দক্ষালয়, অন্য দিকে দেব-দানবের সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য। দক্ষালয়ে যজ্ঞ হইতেছে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছেন, ভূতেরা কাহারও আনাভিলম্বিত সুপক্ক দাড়ি দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে,

স্থূল টিকির গোছা ধরিয়া তাহাকেও চীৎপাত করিয়া ফেলিয়া দিতেছে! ছাগমুণ্ড শ্রীমান দক্ষ গায়ে মেরজাই আঁটিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দোর্দণ্ডপরাক্রমশালী জামাতার স্তব করিতেছেন।

অপরদিকে সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া সুরাসুর মনোমোহিনী নারীমূর্তিতে নারায়ণ; দেবগণ করজোড়ে সেই পূর্ণযৌবনা নিরুপমা বিশ্ববিমোহিনী নারীমূর্তির সম্মুখে ভক্তিভরে দণ্ডায়মান; দানবগণ চকিতনেত্রে সেই বিশ্বমোহিনী মূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, পশ্চাতে মন্দরস্থিত ঘূর্ণায়মান মহাসমুদ্রের তরঙ্গশিরে শুভ্র ফেনকিরীট, প্রভাতসূর্যের লোহিত কিরণ তাহার উপর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিকাশ করিতেছে।

এই চিত্রের পার্শ্বেই মহাকালী প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে অসুর-ধ্বংসে প্রবৃত্ত; ললাটনেত্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে, গলে মুণ্ডমালা, এক হস্তে শোণিতরঞ্জিত খড়্গ, অন্য হস্তে সদ্যশিচ্ছন্ন অসুরমুণ্ড, তাহা হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্তধারা ঝরিতেছে; শৃগাল ঊর্ধ্বমুখে সেই শোণিত পান করিতেছে; বৃক্ষের নিষ্পত্র শাখায় বসিয়া কাক ডাকিতেছে দেবীর দেহের আভায় চারিদিকের লোহিত আলো নীলাভ হইয়া উঠিয়াছে; দেবীর নিবিড়মুক্ত কেশদাম ঝটিকাসঞ্চালিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় উড়িতেছে; দেবী উন্মত্তার ন্যায় খড়্গ চালাইতেছেন; দানবের দল, কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ছিন্নপদ– কোন মস্তকহীন দেহ গড়াগড়ি যাইতেছে; অসুরগণের শোণিতলেহনের জন্যই বুঝি দেবীর সুলোহিত লোল রসনা 'লক্ লক্' করিতেছে! তাঁহার পদতলে শিব; উন্মত্তা কালী পতিবক্ষে দণ্ডায়মানা, তাঁহার নয়নে বিদ্যুৎ ঝলকিতেছে; দানবগণের হস্তী ও অশ্বসমূহ ভয়ে পলাইতেছে। ধার্মিকগণ দেবগণ দেবীর এই সংহারমূর্তিতে ভীত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন। দেবী অপর দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে বরাভয় প্রদান করিতেছেন।

'চালি'র অন্য দিকে ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্তিতে জগৎরক্ষায় প্রবৃত্ত। দানবগণ যোদ্ধৃবেশে কেহ অশ্বে, কেহ গজে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রে ধাবমান; তাহাদের দেহ লোহিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত; মস্তকে শিরস্ত্রাণ, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে শরাসন, কোষে অসি ও পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর; তাহারা সিংহবাহিনীর মহিমান্বিত মুখচ্ছবি, তাঁহার প্রশান্তভাব, প্রচণ্ড তেজ ও পূর্ণ গৌরবের অনুপম মাধুর্য নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে, কোষের তরবারি উন্মুক্ত হয় নাই, তীর তূণীরবদ্ধ!-চিত্রকর বহু পরিশ্রমে পরিপাটী করিয়া সমস্ত চিত্রাঙ্কন শেষ করিল। তাহার এই চিত্র আঁকিতে পঞ্চমীর রাত্রি অতিবাহিত হইল।

ষষ্ঠীর প্রভাতে ঢাকী ও ঢুলির দল গ্রামান্তর হইতে পূজা-বাড়িতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের শুভাগমন বার্তা একবার গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া দিল! ঢাকের পিঠে কাঠি পড়িতেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই ভাবেই দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কোন মেয়ের চুলগুলি দুলিতেছে, আঁচল মাটিতে লুটাইতেছে; কোন ছেলের এক হাতে ছোট 'পাখি'র আধ 'পাখি' মুড়ি, অন্য হাতে একটা অর্ধভক্ষিত শশা শয্যা হইতে উঠিয়া জলযোগটা যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সে সেই যোগাড়েই ব্যস্ত ছিল, এমন সময় হঠাৎ বাজনা বাজিয়া উঠিল, আর মুড়ির 'পাখি' ও শশা হাতে লইয়াই দৌড়! কোন কোন মেয়ে তাহাদের ছোট ছোট ভাইবোনকে কোলে লইয়া ঠাকুর দেখিতে আসিল; কিন্তু ঠাকুর সাজানো এখনও শেষ হয় নাই! চিত্রকরগণের কেহ গণেশের সাদা শুঁড়ে ও লাল পেটে ঘামতেল মাখাইতেছে, কেহ বা সিংহের মাথায় সোনালী জগ্‌জগা আঁটিয়া কৃত্রিম কেশরের সৃষ্টিকার্যে মনঃসংযোগ করিতেছে।

বাঁধানো বেলগাছের তলায় বোধনপূজা ও ঘটস্থাপনা শেষ হইলে অপরাহ্নে দেবী বেদীতে উঠিলেন। জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল; পল্লীরমণিগণ 'লক্ষণ' করিবার জন্য গৃহের দ্বারে দ্বারে আলপনা দিতে লাগিলেন, চৌকাঠের মাথায় সিন্দুর ও শ্বেত চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হইল। প্রত্যেক গৃহ হইতে ধূপের সুগন্ধ উঠিতে লাগিল; পৌরযুবতিগণ মনোজ্ঞ করিয়া চুল বাঁধিয়া কপালে একটি ছোট সিন্দুরের টিপ্ কাটিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া দীপ হস্তে গৃহ হইতে গৃহান্তরে 'সন্ধ্যা দেখাইতে' লাগিলেন; কেহ বা তুলসীমূলে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ রাখিয়া নতজানু হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন; বিধবাগণ হরিনামের মালা লইয়া চন্দ্রালোকিত সোপানে উপবেশন করিলেন। শুক্লা ষষ্ঠীর খণ্ডচন্দ্র শরতের নির্মল নীল আকাশ হইতে ম্লানহাস্য বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই আলোকে পরিচ্ছদ সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ, বৃক্ষান্তরালবর্তী গৃহস্থের মৃৎ-কুটীর, পথপ্রান্তস্থ আম কাঁটালের গাছ, কলাবাগান, তৃণগুল্ম সমাকীর্ণ বেগুনের ক্ষেত এবং পুষ্করিণীর কালো জল ছবির ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

আজ রাত্রে পূজা-বাড়িতে কাহারও চক্ষে ঘুম নাই। রান্নাবাড়ীর কোন দিকে ভিয়ান আরম্ভ হইয়াছে, কোন দিকে লুচি ভাজিবার জন্য বড় বড় কাঠের কেটো, পিতলের পরাত, কড়াই, চাক্তা, বেলুন, ঝাঁঝরা বাহির করা হইয়াছে। বারান্দায় বসিয়া পাড়ার অনাথা বর্ষীয়সী বিধবার তরকারী কুটিতেছে; আলু, পটল, সূর্যিকুমড়ো ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া বড় বড় ঝুড়ি বোঝাই করিতেছে। চাকরেরা আলোর বন্দোবস্ত করিতেছে। ঢাকী-বাজন্দারেরা কলাপাতে চিঁড়াদই মাখিয়া আঙ্গিনার এক পাশে ফলারে বসিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের পাশে স্তূপীকৃত একটা ছাইগাদার অদূরে

বসিয়া ও লোলজিহ্বায় লালা সঞ্চয় করিয়া এক জোড়া কুকুর লুব্ধদৃষ্টিতে ফলারের পাতের দিকে চাহিয়া আছে।

আর রাত্রি নাই, পূর্ব দিক অল্প ফরসা হইয়াছে। আকাশে এখনও তারা আছে, কিন্তু পূর্বাকাশ বিরলনক্ষত্র; সমস্ত গ্রামখানি তরল অন্ধকারের ক্রোড়ে নিদ্রিত। চারি দিক নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে এক একবার শীতল বাতাস বহিতেছে। বায়ু প্রবাহে শিথিলবৃন্ত শুভ্রদল প্রস্ফুটিত শেফালিকাগুলি শাখা হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃক্ষমূল অচ্ছন্ন করিতেছে, যেন শুভ্র সুকোমল আসন বৃক্ষমূলে প্রসারিত হইয়াছে।

কাক ও দোয়েল উষার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার পূর্বেই পূজা-বাড়িতে এক সঙ্গে ঢাক বাজিয়া উঠিল। প্রায় আধ ঘন্টা পরে ঢাক থামিলে রশুনচৌকীর দল গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া কোমল রাগিণীতে আগমনী গায়িতে লাগিল। সে সঙ্গীত প্রীতি, সহানুভূতি ও পুলকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। আজ এই শুভ্রশিশির বিন্দুশোভিত রক্তিমরাগরঞ্জিত শরতের নির্মল প্রভাতে হৃদয়ের সকল আবেগ ঢালিয়া রশুনচৌকী যে রাগিণী গায়িতে লাগিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোমল মধুর মিলন সংঘটিত হইল। আজ এক বৎসর উমা পিতৃগৃহে আসেন নাই; গিরিরাজ কন্যা আনিতে জামাতাগৃহে গিয়াছিলেন, কিন্তু দিগম্বর উমাকে পাঠান নাই। উমাকে কোলে না পাইয়া গিরিরাণী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন; তাহার বদন মলিন, রুক্ষ কেশদাম আলুলায়িত, শয্যা কন্টক তুল্য; রাণী কন্যা-জামাতার উপর অভিমান করিয়া ধরায় পড়িয়া আছেন সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। রাত্রিশেষে ঈষৎ তন্দ্রা আসিয়াছে; অরুণের কনককিরণ গবাক্ষপথে গৃহকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে; রাণী স্বপ্ন দেখিতেছেন, অন্তর্যামিনী কন্যা মাতার দুঃখে ব্যথিত হইয়া গণেশকে ক্রোড়ে লইয়া মাতৃসন্নিধানে আসিতেছেন। এই আনন্দ-সংবাদ শ্রবণমাত্র বিষণ্ন রাজপুরী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কুসুমসুরভিত সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল দিকে দিকে এই সুসংবাদ বহন করিতে লাগিল; সানাই করুণস্বরে গায়িতে লাগিল–

'গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী!'

পীতরৌদ্রসমুদ্ভাসিত শারদ প্রভাতে সানাইয়ের এই সুমধুর সঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। শাখাবিরহিত বল্কলপূর্ণ সুদীর্ঘ বাঁশের কোঁড়ার উপর বসিয়া দহিয়াল পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া গায়িতে লাগিল। পাঠক ঠাকুর প্রাতঃস্নানান্তে প্রতিমার পীঠতলে বসিয়া সর্বশরীর দুলাইয়া নতমস্তকে অনর্গল চণ্ডী পাঠ করিতেছেন;-তাঁহার পরিধানে শুভ্র তসরের ধুতি, গাত্রে রেশমের নামাবলী, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা

এবং হৃদয়ে সুগভীর ভক্তি। বেলোয়ারী ঝাড়ের উপর প্রভাতরৌদ্র সবুজ নীল লাল ও বেগুনী রঙের আভা বিকীর্ণ করিতেছে, আর চাষার ছেলেরা 'বুলু'- দেওয়া কাপড় পরিয়া কোমরে কচ্ছাপেড়ে চাদর জড়াইয়া ঠাকুর দেখিতে আসিতেছে। একটা খুঁটীতে লম্বা দড়ি দিয়া তিন চারিটি নধর কালো পাঠা বাঁধা; তাহাদের সম্মুখে কতকগুলি কাঁটালপাতা;- তাহারা আশু বিপৎপাতের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াই যেন কাতরচক্ষে চারিদিকে চাহিয়া আর্তনাদ করিতেছে!

বেলা দশ এগারটার মধ্যে সপ্তমীপূজা শেষ হইয়া গেল। যাঁহারা শাক্ত, তাঁহাদের বাড়ি মহাসমারোহে বলিদান হইল; যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের বাড়িতে পাঠা-বলি হইল না; কিন্তু ক্রিয়া ত বাদ পড়িবার যো নাই, সেখানে দেবীপদে সিন্দুর-রঞ্জিত উৎসর্গীকৃত একটা বড় চালকুমড়া মহা আড়ম্বরে বলি দেওয়া হইল।

বলিদানের পর আরতির বাজনা বাজিতে লাগিল। আরতি শেষ হইলে নিমন্ত্রিত লোকজনের আহারাদির অনুষ্ঠান। দেওয়ানজী মহাশয়ের বাড়িতে অন্যান্য ব্যাপারের মত ফলারের আয়োজনও কিছু অতিরিক্ত। বিভিন্ন স্থানে দলে দলে লোক খাইতে বসিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার আমমোক্তাররা পরিদর্শন কার্য শেষ করিতেছে; তবে যাঁহাদের বিশেষ খাতির না করিলে নয় তাঁহাদের-অর্থাৎ উকীল, মোক্তার, থানার দারোগা, আদালতের আমলা প্রভৃতির কাছে তিনি ঘন ঘন আসিয়া 'আজ্ঞে ছানাবড়া চাই?' 'দৈ কি রকম হয়েছে?' ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দেওয়ানজী উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী অখাদ্য হইয়া থাকিলেও মুখের উপর কেহই খারাপ বলিবে না, সুতরাং কোনপ্রকার মিষ্টান্ন আহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও তাঁহার আক্ষেপের কারণ নাই, সংখ্যাধিক্যের উপরেই তাঁহার আত্মপ্রসাদ নির্ভর করে! লোকে যদি বলে, 'দেওয়ানজী মহাশয়ের বাড়ি বিশ রকম মেঠাই হয়েছে'–তিনি তাঁর মহীমা প্রচারিত হইল ভাবিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট।

লোকজন আহারে বসিলে গ্রাম্য গোয়ালারা বাঁকে করিয়া বড় বড় নৈবেদ্যের বারকোষগুলি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণবাড়িতে বিলি করিতে চলিল। কতকগুলি অনুগত ব্রাহ্মণের গৃহেই এই সকল নৈবেদ্যবিতরণের ব্যবস্থা আছে; তাহাদের এই বার্ষিক বাদ পড়িবার যো নাই।

নিমন্ত্রিত পুরুষগণের আহার শেষ হইতেই অন্তঃপুরে কলরব আরম্ভ হইল। নিমন্ত্রিত রমণীরা দলে দলে অন্তঃপুর পূর্ণ করিলেন। সকলেই উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া দেওয়ানবাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন; কেহ কেহ

ছোট ছেলে মেয়েদের সাজাইয়া সঙ্গে আনিয়াছেন। কাহারও সঙ্গে একটি তিন চারি বৎসরের ছেলে কালো মখমলের পোশাক-আঁটা, পায়ে ঝুঁটা মতির থোপ-লাগানো জরীর জুতা এবং মাথায় যাত্রার দলের রাজার মত বাহারে তাজ! যাঁহাদের ভাল গহনা নাই, তাঁহারা কোন সখীর নিকট দুই একখানি অলঙ্কার ধার লইয়া ফলার খাইতে আসিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বিভিন্ন দল বসিয়া গিয়াছে। যাঁহাদের গহনা বেশি, বয়স কম, রঙ ফরসা, স্বামী ভাল চাকরী করেন, দুই চারিখানি নাটক নভেল পড়া আছে, তাঁহাদের দলেরই প্রাধান্য; তাঁহাদের পায়ে ডায়মন্‌কাটা মল, পরিধানে উজ্জ্বল বেনারসীর বা রঙ্গীন পারসী শাড়ী, হাতে বালা ও চুড়ি, সেমিজের উপর সুচিক্কন কারুকার্যখচিত জাপানী সিল্কের সুদৃশ্য বডিস্। কাহারও 'উপর হাতে' ডায়মন্‌কাটা অনন্ত ও তাবিজ শোভা পাইতেছে, কানে দুল দুলিতেছে। কাহারও কানে কান, তাহার সহিত কনকলতায় আবদ্ধ সোনার পরী,-যুবতীর সযত্নরচিত সুরভিত সুদৃশ্য 'খোঁপা'য় অঙ্গ ঢালিয়া সোনার বাঁশী ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া সুবর্ণের জয়ঘোষণা করিতেছে! ইঁহাদের অধরে হাস্যসুধা, নয়নে কটাক্ষ-বহ্নি, হৃদয়ে প্রেমের উৎস। এই সকল সৌভাগ্যবতী যুবতী সংসার-সরোবরের ফুল্ল কমলিনী; পূজাবাড়িতে ইঁহাদেরই আদর সর্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহাদের মধ্যে হাসি, গল্প ও তাসখেলা চলিতেছে; কুচিৎ কেহ অদূরে বসিয়া একখানা 'চণ্ডীদাস' খুলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যে'র মাধুর্য উপভোগ করিতেছেন; কেহ বা 'বিষবৃক্ষ'খানি শেল্‌ফ হইতে টানিয়া লইয়া হরিদাসী বৈষ্ণবীর গানে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। দাসীরা এখানে ঘন ঘন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিনা অনুরোধে মুঠা মুঠা পান আনিয়া মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছে এবং যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া মুখ তুলিয়া সস্মিতবদনে বলিতেছে-"কি লা ভবী! ভাল আছিস্ ত? অনেক দিন যে তুই আমাদের বাড়ি যাস্ নি?" অমনই ভবী হাতে স্বর্গ পাইতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঝি-মহলে উপস্থিত হইতেছে, এবং কথায় কথায় বলিতেছে,-"চাটুয্যেবাড়ির ছোট বৌ-ঠাকুরুণের মত মানুষ এ কলিতে আর দু'টি দেখা যায় না; অত যে বড় মানুষের ঝি, একটু 'ন্যামাক্' 'গিদের' নেই। আসল বুনিয়াদী ঘরের মেয়ে কি না!"

দেওয়ানজীর কন্যা মনোরমা শিমলার একখানি অতি উৎকৃষ্ট মিহি কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া, মস্তকের নিবিড় কেশরাশি চূড়াকারে সম্মুখভাগে বাঁধিয়া, হাতের মোটা মোটা বালা দু'গাছা উপর হাতের দিকে ঠেলিয়া, একমুখ পান চিবাইতে চিবাইতে মহিলাদের আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। মনোরমার মুখে হাসি, মনে উৎসাহ, প্রাণে আনন্দ, নিমন্ত্রিতাগণকে মিষ্টবাক্যে আহ্বান করিয়া তিনি একেবারে তাঁহার সুসজ্জিত শয়ন কক্ষে লইয়া যাইতেছেন; কিন্তু বাড়িতে কক্ষের সংখ্যা অনেক, সুতরাং

যুবতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া মজলিস আরম্ভ করিয়াছেন।

স্থানান্তরে গৃহিণী প্রৌঢ়াগণের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। তাঁহাদের ছোট ছোট মেয়েরা মুহূর্ত স্থির নহে;-তাহারা এ ঘরে যাইতেছে, ও ঘরে যাইতেছে পূজায় দালানে উঠিতেছে, আবার মুহূর্ত পরেই হয়ত চীলেকোঠায় উঠিয়া সমস্ত গ্রামখানির উপর নিতান্ত অবহেলাপূর্ণ সগর্বদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে!

দুই ঘন্টা ধরিয়া মেয়েরা আহার করিলেন। আহার বিষয়ে গ্রাম্য পুরুষগণের রুচিনৈপুণ্য আছে, কিন্তু গ্রাম্যরমণীগণের অনেকেই পরিমাণে পোষাইয়া লন! পরিবেশনকালে ইঁহাদের চক্ষুলজ্জা অতিরিক্ত হইলেও, আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্যের নিন্দাবাদে তাঁহাদের উৎসাহের অভাব নাই। অবশ্য সকলেই যে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন, এ কথা বলাবাহুল্য।

মেয়েদের খাওয়া শেষ হইতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে প্রকাণ্ড টাপোর; আঙ্গিনায় বাঁশ পুঁতিয়া উপরে চাটাইয়ের ছাউনি দিয়া এই টাপোর নির্মিত হইয়াছে। টাপোরের নীচে কলার কাঁদি, বাতাবী লেবু, নারিকেল, কুমড়া, আনারস প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল ছোট ছোট দড়িতে ঝুলিতেছে; প্রত্যেক পূজা বাড়িতেই টাপোরের নীচে এইভাবে ফল ঝুলাইবার ব্যবস্থা আছে। কেহ পূজা বাড়ীতেই টাপোরের নীচে এইভাবে ফল ঝুলাইবার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ রাত্রিতে আলো জ্বালিবার জন্য টাপোরের বাঁশের সঙ্গে দুই একটা বেলোয়ারি-'হাঁড়ি' বা লণ্ঠন ঝুলাইয়া রাখিয়াছে; কিন্তু দেওয়ানজীর বাড়িতে এ সকল দ্রব্যের আয়োজন অত্যন্ত অধিক। সেখানে মোটা মোটা সুদীর্ঘ তেহারা দড়িতে বারো বা ষোল ডালবিশিষ্ট সুবৃহৎ বেলোয়ারি-ঝাড়, বড় বড় 'বেল', হিজের লাল নীল সবুজ ডোম-বিশিষ্ট সুদৃশ্য 'হ্যাঙ্গিং ল্যাম্প' ঝুলিতেছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল; টাপোরের নিম্নভাগ, তিন দিকের সুদীর্ঘ বারান্দা, অদূরবর্তী রাজপথ, শতাধিক দীপের আলোকে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। শারদ সপ্তমীর শশধরের অস্ফুট শুভ্র কিরণ-সম্পাতে ও উৎফুল্ল গ্রামবাসিগণের সমাগমে গ্রামের পথগুলি যেন সজীব হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা গভীর হইতে না হইতেই আরতির বাজনা ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল; ধূপের ধুমে ও সৌরভে পূজামণ্ডপ পরিপূর্ণ; প্রতিমার মুখে, ডাকের সাজে আলোকরশ্মি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; দুই পাশে দুইখানা বৃহৎ চিত্রাঙ্কিত তালপাতার পাখা ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে ঢং ঢং করিয়া কাঁসরের শব্দ উঠিতেছে; পুরোহিত একাগ্রচিত্তে বামহস্তে ঘন্টা নাড়িতেছেন, আর দক্ষিণ হস্তে

পঞ্চপ্রদীপ ঘুরাইয়া প্রত্যেক দেবদেবীর আরতি করিতেছেন; রমণিগণ প্রতিমার পার্শ্বে পরস্পরের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন; সকলেরই কৌতূহল প্রদীপ্ত প্রসন্ন দৃষ্টি মা দুর্গার নথবিভূষিত পীতোজ্জ্বল শ্রীমুখে সন্নদ্ধ। যাহারা পশ্চাতে পড়িয়াছে, তাহারা আরতি দেখিতে না পাওয়ায় ভীড় ঠেলিয়া আগাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হইবার উপায় নাই; সুতরাং সকলে পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কথাবার্তা সমস্ত বন্ধ। অনেকেরই ললাটে ঘর্মবিন্দু উদগত হইল।

পুরুষ দর্শকগণ উৎসব প্রাঙ্গণে আলোকিত ফানুসের নীচে দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে আরতি দেখিতেছে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ভদ্রলোক, চাষা-সকলেই প্রতিমায় বদ্ধদৃষ্টি। পূজামন্ডপ জনপূর্ণ, প্রতিমার চালি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; তথাপি সকলে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া আছে। আট দশটা পাখাওয়ালা ঢাকের প্রচন্ড নিনাদে সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

দীর্ঘকাল পরে আরতি শেষ হইয়া গেল। দর্শকগণ অবনতমস্তকে দেবীচরণে প্রণাম করিয়া একে একে পূজামন্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। ঢাকীরা আরতির বাদ্য ছাড়িয়া নাচনের বাজনা ধরিল। দলে দলে নববস্ত্র পরিহিত চাষার ছেলে- কেহ কোমরে চাদর জড়াইয়া, কেহ বা কোচাঁন পেড়ে চাদরখানি গলায় ঝুলাইয়া তাহার দুই প্রান্ত বামহস্তের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঈষৎ বঙ্কিম মস্তক স্পর্শ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতেছে, আর ঢাকীরা মাথা নাড়িয়া, বড় বড় ঢাকের পাখা দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতেছে-

"ও মা রণমাঝে দিগম্বরী নাচ গো!"

দেখিতে দেখিতে অনেক যুবক ও বৃদ্ধা আসিয়া সেই নৃত্যে যোগ দিল।

গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা দলে দলে গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোন দল চলিতে চলিতে সেই জ্যোৎস্নালোকে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন; কোন কোন দল দীঘির বাঁধা-ঘাটে মুক্ত আকাশতলে বসিয়া আছেন, চঞ্চল নৈশ সমীরণ-প্রবাহ দেহে বীজন করিতেছে; চাদরের অগ্রভাগে অল্প অল্প উড়িতেছে। সম্মুখে দীঘির কালো জল কানায় কানায় পূর্ণ; তাহার উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছে, দুই একখন্ড অভ্র-শুভ্র মেঘ মুক্তপক্ষ রাজহংসের ন্যায় অত্যন্ত লঘুগতিতে আকাশের এক দিকে হইতে অন্য দিকে ভাসিয়া যাইতেছে; দুই চারিটি নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকচ্ছটা আকাশের স্বচ্ছ বাতায়ন-পথে ধরাতলে প্রতিফলিত হইতেছে- জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ-প্লাবনে নক্ষত্রগুলো নিষ্প্রভ বোধ হইতেছে; যেন সেই সুদূর নীলাম্বরের পুরবাসিনী কোনও নক্ষত্র-বালিকা

যুগান্তরপূর্ব হইতে নিদ্রা-বিহ্বল আনত নেত্রে শুষ্ক বসনা উৎসবচঞ্চলা হর্ষমুখরা ধরণীর দিকে চাহিয়া আছে!

রাত্র অধিক হইলে গ্রামের পথে জনসমাবেশ ক্রমে হ্রাস হইল। কিন্তু ভদ্রমহিলাবর্গের অনেকে মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রস্তপদক্ষেপে সঙ্কুচিতভাবে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরিয়া প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইতেছেন, আর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন ঈষৎ উত্তোলন করিয়া কৌতূহলপূর্ণনেত্রে এক একবার পথের এ-দিক ও-দিক দেখিয়া লইতেছেন; জন্মান্ধ জীবনে সহসা একবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলে যেভাবে চর্তুদিকে চাহিয়া দেখিতে থাকেন, তেমনই আগ্রহকুল তৃষিত দৃষ্টি!

রাত্রি দশটার সময় আহার শেষ করিয়া গ্রামস্থ 'বাবুরা' দেওয়ানজীবর বাড়িতে সখের থিয়েটআর দেখিতে চলিলেন। স্থানীয় বীনাপাণি রঙ্গালয়ের 'এমেচিয়র' বাবুরা পানানন্দে মত্ত হইয়া কাব্যনন্দভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। 'কনসার্ট পার্টি'র বাজনা অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিয়া থামিয়া গেল, 'ড্রপসিন' তুলিবার ঘন্টা পড়িল; কিন্তু তাহার দড়ি চরকিতে আটকাইয়া যাওয়ায় 'পট' আর উঠিতে স্বীকার করিল না! স্টেজ ম্যানেজার সদলে আধ ঘন্টা ধরিয়া সজোরে টানাটানি করিয়া ঘর্মাপ্লুত হইলেন, দর্শকগণের মধ্যে ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। অবশেষে বিস্তর চেষ্টায় যদি বা 'পট' উঠিল, কিন্তু তখনও রাবণের রাজা সাজিতে বাকি ছিল; তিনি 'সাজঘরে দাঁড়াইয়া দাড়ির অভাবে দশ দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর বেশকারী একটি দাড়ি টানিয়া বাহির করিল, কিন্তু তাহা একেবারে সাদা, বোধ করি কোনও মুণি-ঋষির দাড়ি, অগত্যা সেই দাড়িই মুখে আঁটিয়া রাবণ স্টেজের রাজসভায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহার পশ্চাদ্বর্তী ভগ্নদূতকে ভৈরব গর্জনে বলিতে লাগিলেন-

"নিশার বারতা সম তোর এ স্বপন,
রে দূত! কাতরবৃন্দ যার ভুজবলে
অমর, সে ধনুর্ধরে বাঁধিল রাঘব?
ভিখারী সম্মুখে রণে ফুল- ধেনু দিয়া
কাটিল কি বিধাতারে? শাশ্মীলী তরবর!"

'হুইস্কী'র প্রসাদে রাবণের কণ্ঠে এই প্রকার অভিনব মেঘনাদবধ কাব্যের অবতারণায় দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং যাহারা কিছু না বুঝিল তাহারা আরো জোরে হাসিতে লাগিল! ঘন ঘন হাসি ও করতালিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বক্তৃতা বন্ধ হইল না। পূর্ণ উৎসাহে অভিনয় চলিতে লাগিল।

ও-দিকে রাত্রি বারোটার সময় গোঁসাইবাড়িতে পাঁচালীর দল আপ্রাণ চীৎকারে দাশুরায়ের আগমনী আরম্ভ করিল। নিস্তব্ধ নিশীথে তাহাদের গীতধ্বনি সমস্ত গ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

এইরূপে অষ্টমী ও নবমীপূজার দিন দুইটি সুখ-স্বপ্নের মত দেখিতে দেখিতে কাটিয়ে গেল।

নবমীর রাত্রিতেই দশমীর বিদায়ের ছবি উৎসবপ্রাঙ্গণে বিষাদের ছায়া নিক্ষেপ করিল। দেখা গেল টাপোরের নীচে আলোগুলি একে একে নিভিয়া গিয়াছে; কেবল চণ্ডিমণ্ডপের লাল ও নীল ফানুসের ভিতর হইতে মৃদু আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে সেই বৃহৎ অট্টালিকার অন্ধকার সম্যক অপসারিত হইতেছে না এবং প্রতিমার দুই পাশে সুদীর্ঘ দীপগাছার উপর যে দু'টি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহাও নির্বাণোন্মুখ; তাহার ম্লান আভা প্রতিমার ডাকের সাজে, গণেশের শুড়ে, অসুরের রক্ত ত্রিবীরতিলক-চিহ্নিত সুপ্রশস্ত নীল ললাটে এবং ভগবতীর তৈলচর্চিত পীতাভ মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেছে। গণেশের পাশে বস্ত্রাবৃত কলাবৌ, দেওয়ালে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। দিবারাত্রির অবিরাম পরিশ্রমে ক্লান্ত পুরবাসিগণ অবসন্ন দেহে যে যেখানে পাইয়াছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে! সমস্ত গ্রাম তখনও নিদ্রামগ্ন; কেবল দুই তিনজন টহলদার করতাল বাজাইয়া উষার মৃদু আলোকে বিজন গ্রাম্যপথ ধ্বনিত করিয়া সমস্বরে গাহিয়া চলিয়াছে-

'গা তোল পুরবাসী, রজনী পোহাইল,
কর সবে বিভূগুণ গান।'

সেই গান সুখসুপ্ত পুরবাসীবর্গের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে; যেন দেবলোকের কোনও মঙ্গল-স্বপ্ন মোহন সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়া সুপ্তিঘোরে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে!

ক্রমে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল। আকাশ অতি নির্মল। প্রভাতসমীরের মৃদু হিল্লোলে বৃক্ষপত্র সর্ সর্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং তাহা হইতে মুক্তার ন্যায় নির্মল শিশিরবিন্দু টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, আর শিউলী গাছের সর্বোচ্চ শাখায় বসিয়া একটি দহিয়াল অতি মধুরস্বরে শারদ প্রভাতের আহ্বানসঙ্গীত গায়িতেছে।

প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া ছেলেরা তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আজ দুর্গাঠাকুরাণীর কাছে পুষ্প ও দুর্গানামাঙ্কিত বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিতে হইবে; সকলেরই আজ ফুলের দরকার। অনেক আগে ভোর হইয়াছে, এত বিলম্বে ফুল হয়ত পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া ছেলেরা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং দলবদ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি

বোসেদের ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। কাহারও হাতে ধামা, কাহারও হাতে একটা বড় সাজি, কেহ কলাবাগান হইতে একখানা আঁখোট কলাপাতা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাতেই পুষ্পচয়ন করিবে- এই স্থির করিয়া তাড়াতাড়ি খালি হাতেই চলিল। বোসেদের ফুলবাগান গোবিন্দপুরের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাগান। সকল রকম ফুলই সে বাগানে পাওয়া যায়। একটি ছেলে কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড চাঁপা-গাছে উঠিয়া পড়িল। শিশিরে শাখাপল্লব হইতে গুঁড়ি পর্যন্ত সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই; কতবার পা পিছলাইয়া গেল, তথাপি হতাশ বা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সে গাছের আগডালে উঠিয়া বসিল এবং ফুল পাড়িয়া কোঁচড় ভরিতে লাগিল। অসংখ্য স্থলপদ্ম ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া আছে দেখিয়া তাহারা সানন্দে ডাল ভাঙ্গিয়া কুঁড়ি ছিঁড়িয়া শিশিরসিক্ত ফুলে ধামা পূর্ণ করিয়া ফেলিল;- বেলী, গন্ধরাজ, যুঁই ও শিউলী ফুলেও সাজি ভরিয়া গেল। এমন সময় মল পায়ে, নোলক নাকে ছোট ছোট কয়েকটি কাঁসারীর মেয়ে, 'বুঁটি' করিয়া তাহার রং-এর কাপড় ছোপাইবে বলিয়া ডালা-হাতে শিউলীর ফুল কুড়াইতে আসিতেছিল; অর্ধপথে আসিয়াই তাহারা সভয়ে দেখিল, একদল ছেলে বাগানে ফুল তুলিতে আসিয়াছে; দেখিয়াই তাহারা দ্রুতপদবিক্ষেপে পলায়ন করিল। মলের শব্দে ছেলেরা বুঝিল, মেয়েগুলি ফুল কুড়াইতে আসিয়া, তাহাদিগকে দেখিয়া পলাইয়াছে; ফুলগুলি আগেই সংগ্রহ করায় সাফল্য-গর্বে উৎফুল্ল হইয়া তাহারা খুব হাসিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য উঠিল। রৌদ্রের রঙ ঠিক কাঁচা সোনার মত! গাছের পাতায়, কৃষকের কুটীরে, জমিদারের জীর্ণ অট্টালিকায়, নদীর জলে ও শিশিরসিক্ত সবুজ ঘাসের উপর তরুণ অরুণ কিরণ প্রতিফলিত হইল। পূজাবাড়িতে একটা বারান্দায় ছেঁড়া কম্বলের উপর বসিয়া রশনচৌকীর দল যে সুরে সানাই বাজাইতে লাগিল, তাহা অতি করুণ ও বেদনাপ্লুত- তাহাতে সকলেরই মনে শুধু মর্মভেদী বিদায়ের অশ্রু সজল কাহিনী জাগিয়া উঠিতেছিল। উৎসব গৃহে ছেলেরা মহানন্দে দাপাদাপি করিতেছে; কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ কাহাকেও ডাকিতেছে; কেহ ভিখারীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। আজ দশমীর এই বিষাদাপ্লুত প্রভাতে সানাইয়ের আর বিরাম নাই, সে শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরহগাথা গাহিয়া যাইতেছে। আজ গিরিরাজ উমাকে বৎসরের মত বিদায় দিবেন। তিন দিবসের উৎসব যে নিমিষের মধ্যে শেষ হইয়া গেল, তাই পিতামাতার চক্ষে জল ও বক্ষে দুর্বহভার! আজ মা আনন্দময়ী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবেন; সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিদীর্ণকণ্ঠে সেই কথাই সমস্ত গ্রামে ঘোষণা করিতেছে। আজ মাতা তাঁহার আদরিণী কন্যা উমাকে ক্ষুণ্ন মনে সারা বৎসরের জন্য শ্বশুর বাড়ি পাঠাইতেছেন।

বেলা দশটার মধ্যে 'যাত্রা' সারিয়া লইতে হইবে। পল্লীগ্রামে হিন্দুমাত্রেই দশমীর দিন বিল্বপত্রে দুর্গানাম লিখিয়া তাহা দেবীপদে অঞ্জলী দিতে পাঠান। ইহাকেই 'যাত্রা করা'বলে। নয়টার মধ্যে সকলেই বিল্বপত্রে দুর্গানাম লিখিয়া দিল; যে সকল ছোট ছোট ছেলে সবেমাত্র লিখিতে শিখিয়াছে, তাহারাও তাহাদের দাদা বা কাকার কাছে বসিয়া পরম গম্ভীরভাবে খাকের কলম দিয়া মোটা মোটা হরফে কতকগুলি বিল্বপত্রে 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' লিখিতেছে! তাহার পর ছেলেরা কেহ স্নান করিয়া কেহ বা স্নান না করিয়াই ময়ূরকণ্ঠী, চেলী, তসর প্রভৃতি নানা রঙের পট্টবস্ত্র পরিয়া ও দোজাতে সর্বশরীর ঢাকিয়া খালি পায়ে 'যাত্রা করিতে' বাহির হইল। হাতে একখানি কাঁসার ডিস, তাহার উপর দুর্গার নামলেখা কতকগুলি বিল্বপত্র ও ফুল; ডিসখানির এক পাশে একখানা সিঁদুর ও একটা পিতলের পুরাতন কৌটা; কৌটার মধ্যে সিন্দুররঞ্জিত কয়েকটি টাকা ও আধুলি- দুই একটা টাকা বাদশাহী আমলের, দুই একটা বা নতুন; তাহাদের 'করচে ও একটা টাকা বা আধুলি। কৌটার টাকা যেন কোথাও পড়িয়া না যায়, এজন্য পিতামাতা ছেলেদের সাবধান করিয়া দিলেন। তাহারা মহা উৎসাহে হাসিমুখে পূজাবাড়ির দিকে ধাবিত হইল।

'যাত্রা করিবার' জন্য প্রত্যেক পরিবারের এক একটি পূজাবাড়ি নির্দিষ্ট আছে; তাহারা সেই বাড়ি ভিন্ন অন্য বাড়িতে যাত্রা করিতে যায় না। পূর্বপুরুষ হইতে তাহাদের পরিবারে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে; তবে দৈবাৎ পূর্বনির্দিষ্ট কোনও বাড়িতে পূজা বন্ধ হইলে যাত্রা করিবার জন্য তাহারা আর একটি বাড়ি ঠিক করিয়া লয়।

ছেলেরা বিল্বপত্র ও পুষ্পপূর্ণ ডিসগুলি লইয়া ধীরে ধীরে পূজাবাড়িতে উপস্থিত হইল; যাহারা ব্রাহ্মণ ও উপবীতধারী, তাহারা স্বহস্তেই ফুল বিল্বপত্র ও সিঁদুর দেবী-চরণে অর্পণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল, তাহার পর ডিসের উপর দুই চারিটা বেলের পাতা ও কৌটায় খানিক সিঁদুর তুলিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিল, ফিরিবার সময় "করচ" হইতে টাকা বা আধুলিটা খুলিয়া দেবী-চরণে স্পর্শ করিয়া কৌটার অন্যান্য টাকার সঙ্গে রাখিয়া দিল। এই টাকাকে 'সাইতের টাকা' বলে; গৃহস্থেরা অতি দুঃসময়েও এ টাকা খরচ করে না। শূদ্রের ছেলেরা চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া পুরোহিতের হাতে ডিসখানি দিয়া ভক্তিভরে দেবী-চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল; সেই সময় তাহাদিগকে এক একটি উৎসর্গীকৃত ফুলের মত পবিত্র দেখাইল। পুরোহিত শূদ্র ছেলেদের হাত হইতে ডিস ও কৌটা লইয়া যথাবিহিত কার্য শেষ করিয়া তাহাদের হস্তে তাহা প্রত্যার্পণ করিলেন; কিন্তু তাহারা যে স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বালকদের মত দেবীর পাদপদ্মে ফুল ও বিল্বপত্র দিতে পাইল না, এ জন্য তাহাদের মনে বড়

দুঃখে দুঃখে ও অভিমানে তাহাদের কোমল মুখ মলিন হইয়া গেল; কিন্তু পথে আসিতে আসিতেই তাহারা সে দুঃখ ভুলিয়া গেল এবং চক্ষুর ছল-ছল ভাব অপসারিত হইল, তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আজ সকল বাড়িতেই বিশেষ সমারোহে আহারের আয়োজন হইয়াছে। গ্রামবাসিগণের বিশ্বাস আজ আহারাদির অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে সারা বছরটা সুখে কাটে। অন্যদিন যে শাকান্নেরও আয়োজন করিতে পারে না, আজ সে যেমন করিয়া হউক, পাঁচখানি ব্যঞ্জনের আয়োজন করিয়াছে।

আহারাদির পর ছেলের দল নৌকা বায়না করিতে মালোপাড়ায় চলিল। আজ বৈকালে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নদীতে বাইচ হইবে। পূর্বদিনই অধিকাংশ নৌকার 'বায়না' হইয়া গিয়াছে; আজ দুই তিন টাকার কমে কোন মাঝি নৌকার 'বায়না' লইতে চাহে না। কোন কোন মাঝির 'বাঁধা ঘর' আছে, প্রতি বৎসর বিজয়ার দিন তাহাদিগকেই 'বাইচের জন্য নৌকা ভাড়া দেয়; সে জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া ও নতুন কাপড় বা চাদর বকশিশ পায়। কোন বৎসর নৌকার ভাড়ার হার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কমবেশি হইলেও এই বাঁধা খদ্দেরের পক্ষে নির্দিষ্ট ভাড়ার ব্যতিক্রম হয় না।

বেলা দুইটার সময় পূজা-বাড়িতে বরণের বাজনা বাজিয়া উঠিল; ঢোল ঢাক ও কাঁশি তালে তালে বাজিতে লাগিল। বরণের বাজনার মধ্যে করুণ ক্রন্দনের যে বিষাদ মাখা মর্মস্পর্শী উচ্ছ্বাস আছে- তাহা কেবল অনুভবযোগ্য; শুনিতে শুনিতে মন উদাস হইয়া পড়ে, বুক যেন খালি হইয়া যায়! মনে হয়, এত আমোদ, এত উৎসব, সকলই আজ ফুরাইল! মা জগদম্বা আজ সত্যই সারা বাঙ্গালা আঁধার করিয়া পতিগৃহে চলিলেন।

বরণের বাজনা বাজিবামাত্র পুরনারীবর্গের কোলাহল উত্থিত হইল। সধবারা বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হইয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা বরণ করিতে চলিলেন; বিধবারা শুভবেশে দূরে দাঁড়াইয়া সজলনেত্রে এই বিদায়দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে গৃহিণী, পুত্রবধূ, তাহাদের পর কন্যারা দেবদেবীগণকে বরণ করিলেন; শেষে কাত্যায়নীর মুখে সন্দেশ ও পান গুজিয়া দিয়া, "আবার এসো মা, সম্বৎসর সকলকে ভাল রেখো, মা"- বলিয়া অঞ্চলে কণ্ঠবেষ্টনপূর্বক নতমস্তকে প্রণাম করিয়া ছল-ছল নেত্রে একটু দূরে দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বরণ শেষ হইলে বাহকেরা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে প্রতিমা নামাইয়া মোটা মোটা সুদীর্ঘ বাঁশের উপর রাখিয়া নূতনরূপে বাঁধিল; তাহার পর তাহা কাঁধে লইয়া পথে

বাহির হইয়া গেল। প্রতিমার মুখ বাড়ির দিকে; কারণ, বাড়ি হইতে দেবীর বিমুখ হইয়া বাহির হওয়া বড়ই অলক্ষণ!- ঢাক ঢোল জোরে জোরে বাজিতে লাগিল; দেবীর ঠিক সম্মুখে রূপার দামাটযুক্ত রেশমের ঝালর- শোভিত প্রকান্ড ছাতা, আড়ানী ও খাস নিশান চলিল। পথ জনাকীর্ণ, পথের দুই ধারে সমবেত নরনারীবর্গ হাত তুলিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিল। দেবীর তৈলচর্চিত মুখের উপর অপরাহ্নের সূর্যকিরণ পড়িয়া চক্ চক্ করিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধারা বলাবলি করিতে লাগিল, "শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে বলে মা কাঁদছেন!"

বেলা চারিটার সময় বাহকগণ প্রতিমা লইয়া নদীকূলে উপস্থিত হইল। দু'খানা নৌকা জুড়িয়া সমান্তরাল বাঁশ ফেলিয়া তাহাতে প্রতিমা তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; প্রতিমা নদীকূলে আনীত হইলে মাঝিরা সেই জোড়া নৌকা তীরের কাছে ভিড়াইয়া রাখিল সকলে হরিধ্বনি করিয়া সেই সমান্তরাল বংশদন্ডগুলির উপর ধীরে ধীরে প্রতিমা স্থাপন করিল; দুলির দুই দিকের দুই নৌকায় চড়িয়া , কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজনা বাজাইতে লাগিল। গ্রামের সকল প্রতিমাই জোড়া নৌকায় নদীর অপ্রশস্ত বক্ষে এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একখানি হাজার মণ বড় নৌকায় দেওয়ানজীর বাড়ির লোক ও অনুগৃহীত পল্লীবাসীর পুত্রকন্যাবর্গে পরিবৃত হইয়া 'ভাসান' দেখিতে উঠিল। নৌকার ছৈ-এর উপর লোহিত পরিচ্ছদভূষিত বরকন্দাজেরা আসাসোঁটা ঘাড়ে লইয়া সদর্পে বসিয়া রহিল। অনেকের হাতে ছোট বড় নিশান, তাহা উড়িয়া উড়িয়া দেওয়ানজীর প্রতিপত্তি ও অর্থ-গৌরবের ঘোষণা করিতে লাগিল। এই নৌকাখানি দেওয়ানজীর প্রতিমার নৌকার অনুগমন করিতে লাগিল।

আজ নদীতে অসংখ্য নৌকা। ছোট ছোট পান্সী ও ডিঙ্গীগুলি আরোহীবর্গে পরিপূর্ণ। কোন নৌকায় তিনখানা, কোন নৌকায় চারিখানা দাঁড়। আমোদপ্রিয় পল্লীযুবকগণ নৌকার উপর বিছানায় বসিয়া স্ফূর্তি করিতেছে! কেহ বাঁধা হুঁকায় তামাক টানিতেছে, আর চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছে; কোন নৌকায় চারিজন আরোহী মুখোমুখি বসিয়া তাস পিটিতেছে; কোন নৌকায় বাজারের দোকানদারেরা টেরি কাটিয়া কামিজের উপর ওয়েস্টকোট আঁটিয়া, তবলা ও মন্দিরা বাজাইয়া টপ্পা গাহিতেছে-

"(আমি) প্রাণের অধিক
ভালবাসি যারে,
না জানি তার কেমন মন
বাসে না আমারে!"

কেহ কেহ বা ধ্রুপদ খেয়ালের সুর ভাজিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, " জোরে টানো- আরো জোরে!" নৌকাগুলি নদী জল আলোড়িত করিয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিতেছে এবং আধ ক্রোশ যাইতে না যাইতে আবার উত্তর দিকে ফিরিয়া আসিতেছে।

বাঁড়ুয্যেদের সঙ্গে চাটুয্যেদের সকল বিষয়েই অনেক দিন হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। আজ দুই দলই দু'খানা নৌকায় বাইচে উঠিয়াছে দু'খানি নৌকাতেই লালপাগড়ী-বাঁধা সুসজ্জিত আরদালীরা লম্বা লাঠি হাতে ছৈ-এর উপর বসিয়া নৌকার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। হঠাৎ চাটুয্যেদের নৌকাখানা ঘুরিয়া আসিয়া বাঁড়ুয্যেদের নৌকার সম্মুখে পড়িল;-বাড়ুয্যেদের নৌকার উপর হইতে বৃদ্ধ বরকন্দাজ হাঁকিল, "এই চার-দেঁড়ে পান্সী- তফাৎ!" বলা বাহুল্য চাটুয্যেদের নৌকার দাঁড় চারিখানা; কিন্তু বাঁড়ুয্যেদের নৌকায় পাঁচ দাঁড়। চাটুয্যেদের পান্সীর দাঁড় চারিখানা হইলেও নবীন খুব পাকা মাঝি; সে চাটুয্যেদের ছোট বাবুকে ডাকিয়া বলিল, "ছোট বাবু, বাঁড়ুয্যেদের পাঁচদেঁড়ের বরকন্দাজের ভারি তেজ! হুকুম হয় ত একবার ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাইচ মারি।" ছোট বাবু হাসিয়া বলিলেন, "পাঁচ পাঁচখানা দাঁড়, চারিখানা দাঁড়ে পারবি কি? হারিস যদি আমার অপমানের সীমা থাকবে না!" নবীন সোৎসাহে বলিল, "কেন পারবো না, হুজু? আমার তিন দাঁড়েই ওর পাঁচখানা দাঁড়কে ঘোল খাইয়ে দিতে পারি, চারখানায় ত কথাই নাই! দুই ঝিঁকেতে আগে বেরিয়ে যাবো বকশিশ কি শুধু শুধুই নেব, হুজুর"? নবীনের কথা শুনিয়া "হুজুর পরমপ্রীত হইয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আচ্ছা তবে লাগ!"

তখন নবীন শক্ত করিয়া হাল চাপিয়া ধরিয়া বাঁড়ুয্যেদের মাঝি কালাচাঁদকে বলিল, "মাকোশার ঠ্যাংয়ের মতন কতকগুলো দাঁড় থাকলেই হয় না! পারিস্ ত আগে বেরিয়ে যা, চোখরাঙ্গানির কি তোয়াক্কা রাখি।" বাড়ুয্যেদের মেজবাবু বলিলেন, "নবুনের ত খুব সাহস দেখচি রে! কালা খুব হুঁশিয়ার খবরদার, যেন আগে বেরোতে না পারে!"

কালাচাঁদ সাবধানে হাল ধরিল। দুই পান্সীর অসুরের মত বলবান নয়টা দাঁড়ী প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল। তাহারা সটান চিৎ হইয়া পড়িতেছে ও উঠিতেছে, বাহুমূলে মোটা মোটা শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, দাঁড়ের জল ঝপ্ ঝপ্ করিয়া নৌকায় উছলিয়া উঠিতেছে বোঠেতে মস্ মস্ করিয়া নূতন দড়ির শব্দ হইতেছে! নদীর দুই তীরে অসংখ্য লোক রুদ্ধ নিশ্বাসে কৌতূহল-বিস্ফোরিত নেত্রে নৌকা দু'খানির দিকে চাহিয়া আছে- কে আগে যাইতে পারে! নবীন মাঝির নৌকার দাঁড়িরা পুরস্কারের লোভে ও প্রবল বিপক্ষকে পরাস্ত করিবার

উৎসাহে এমন জোরে "ঝিঁকে" মারিতে লাগিল যে, বাড়ুয্যেদে পাল্কী বুঝি আর আগে যাইতে পারে না! কালাচাঁদ প্রতিমুহূর্তে পরাজয়ের আশংকায় দাঁড়িদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। -তাহার পাল্কীর গলুয়ের পাশের দাঁড় পুরানো দড়ি দিয়া 'বোঠে'য় বাঁধা ছিল- টানের জোরে কম মজবুত দড়িগাছটা 'ফট্' করিয়া ছিঁড়িয়া গেল; দাঁড়ি ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া ঝপাং করিয়া জলে পড়িয়া গেল! নবীন মাঝির দাঁড়ি চতুষ্টয় ঠিক সেই সময়ে খুব জোরে একটা ঝিঁকে মারিল; আর তাহাকে বাধা দেয় কে? দেখিতে দেখিতে তাহার পাল্কী কালাচাঁদের পাল্কীকে পশ্চাতে ফেলিয়া সাত আট হাত আগে বাহির হইয়া গেল! তীরে দর্শকগণ হাততালি দিয়া উঠিল। ছোটবাবু আনন্দে অধীর হইয়া গালে গরদের চাদরখানা নবীন মাঝির গায়ে ফেলিয়া দিলেন; বকশিশ পাইয়া নবীন তাহা মাথায় বাঁধিয়া নাচিতে লাগিল। - কালাচাঁদ লজ্জায় নতমুখ হইয়া নৌকার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, 'মা বিমুখ হলেন যে! '

বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে জনতা আরও বাড়িয়া উঠিল। নদীতীরেই থানা; থানার সম্মুখে সতরঞ্চি ও গালিচা পাতা; অনেক ভদ্রলোক ভাসান দেখিবার জন্য আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন।

শরৎকালে বানের জল অনেক নামিয়া গিয়াছে, সেজন্য নদীর দুপারে অত্যন্ত কাদা হইয়াছে; দর্শকগণ স্থানাভাবে সেই কর্দমের উপরেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! নদীর অপর পারস্থ ইটের পাঁজার উপর ও শ্রেণীবদ্ধ বাবলা গাছের ডালে অনেক লোক বসিয়া ভাসান দেখিতেছে- তাহাদের পরিধানে লাল, সাদা, নীল- নানা রঙ্গের বাহারে কাপড়; গায়ে মেরজাই; কাঁধে বা মাথায় চাদর ঝুলিতেছে।

পল্লী-রমনীগণ বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া বটতলার ঘাটে প্রকান্ড বটগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ভাসান দেখিতেছেন। সে দিকে পুরুষের সমাগম নাই, সুতরাং তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে নদীর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন নৌকার নির্লজ্জ আরোহীরা ডুগি-তবলা বাজাইয়া অশ্লীল গান গায়িতে গায়িতে যখন সেই ঘাটের অভিমুখে নৌকা বাহিয়া আসিতেছে তখনই তাঁহারা একটু চঞ্চল হইয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া, কেহ গাছের আড়ালে, কেহ বা কোন বর্ষীয়সী রমনীর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন;- আবার নৌকা দূরে চলিয়া গেলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাহাদের কোমল মুখে অপরাহ্নের রৌদ্র প্রতিফলিত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম, কোন কোন বালিকার মস্তকের চূর্ণাকুন্তলরাশি উড়িয়া চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে; একটু ভাল জায়গায় সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য কেহ কাহারও আঁচল ধরিয়া টানিতেছে; কোথাও বা তিন চারি জন সমবয়স্কা যুবতী একত্র দাঁড়াইয়া, কোন্ প্রতিমার গড়ন ভাল হইয়াছে, কাহারা ভাল করিয়া ঠাকুর

সাজাইয়াছে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত। কেহ কেহ নৌকারোহী ঢুলিদিগের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া মুখে আঁচল দিয়া হাসিতেছে, এবং কোন সহচরীর মুখের উপর কৌতুকদীপ্ত চঞ্চল চক্ষু রাখিয়া ঢুলিদিগের হাস্যোদ্দীপক আমোদ-নৃত্য দেখিতে বলিতেছে।

চারিদিকে আনন্দের পূর্ণ উচ্ছ্বাস!

দেখিতে দেখিতে সূর্য পশ্চিম গগণপ্রান্তে নদীর পরপারে আম্রকাননের অন্তরালে ঢলিয়া পড়িল। ধূসর সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। দেওয়ানজীর প্রতিমার নৌকায় বড় বড় মশাল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; শঙ্খ ঘন্টা বাজিতে লাগিল; আরতি আরম্ভ হইল।

নদীজলে অনেক দূর পর্যন্ত মশালের আলো প্রতিফলিত হইতেছে। প্রতিমার নৌকার একপ্রান্তে দেওয়ানজী গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে গম্ভীরভাবে দন্ডায়মান। পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণহস্তে পঞ্চপ্রদীপ ও বামহস্তে ঘন্টা নাড়িয়া ঠাকুরের আরতি করিতেছেন; দর্শকবৃন্দ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে।- শরতের ধূসর সন্ধ্যায় পল্লী প্রান্তবাহিনী তরঙ্গিনী বক্ষে এক অপূর্ব দৃশ্য!

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে ক্রমে ক্রমে প্রতিমাগুলিকে জোড়া নৌকার উপর হইতে ধীরে ধীরে নদীর জলে নামাইয়া দেওয়া হইল; দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল' দিতে লাগিল। যাহারা জলের ধারে ছিল, তাহারা অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া মাথার উপর ছড়াইয়া দিল। প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক নৌকা হইতে জলে নামিয়া পড়িল। কেহ অবগাহন করিতে লাগিল; কেহ কেহ ডুব দিয়া রাংতা কুড়াইতে লাগিল। -বিসর্জন দেখিয়া দর্শকগণ নদীতীর হইতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্তন করিল

সকল প্রতিমার বিসর্জন শেষ হইলে দেওয়ানজীর প্রতিমার বিসর্জন হইল; ঢাকীরা সজোরে বিসর্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল; সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া গায়িতে লাগিল'

"এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদলবাসিনী!"

নৌকারোহী আমোদপ্রিয় যুবকগণ তীরে নৌকা ভিড়াইয়া গৃহে চলিল। দেখিতে দেখিতে নদীকূল নির্জন হইয়া পড়িল। বিসর্জনের বাজনায় গ্রাম্যপথ ধ্বনিত করিয়া ঢাকীরা পূজাবাড়িতে ফিরিয়া চলিল;- অনেকে আদ্রবস্ত্রে, ধীরপদবিক্ষেপে, বিষণ্নমনে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল।

দশমীর চাঁদ শরতের নির্মল আকাশ হইতে উজ্জ্বল শুভ্র কিরণধারা বিকীর্ণ করিতেছে; সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত; বায়ু হিল্লোল মধ্যে চাঁপা ও রজনীগন্ধার গন্ধ বহিয়া আনিতেছে- যেন তাহা শুভ্রজ্যোৎস্নাময়ী শারদযামিনীর সুস্নিগ্ধ

সুরভি- শ্বাস! উৎসব প্রত্যাবৃত্ত পল্লীবাসিগণ সেই জ্যোৎস্নালোকে সানন্দচিত্তে আত্মীয় প্রতিবাসীগণের গৃহে গৃহে ঘুরিতেছে, পরস্পরের মধ্যে প্রণাম আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন চলিতেছে, মিষ্টান্ন ও পান বিতরিত হইতেছে। ভবিষ্যতে সিদ্ধিলাভের আশায় ও বর্তমানে স্ফূর্তির প্রলোভনে গ্রাম্য যুবকগণ গামলায় সিদ্ধি গুলিয়া, তাহাতে দুগ্ধ ও শর্করা মিশাইয়া কেহ এক গেলাস, কেহ আধ গেলাস সরবত পান করিতেছে। নেশায় বিভোর হইয়া কেহ নাচিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ বা গান গায়িতেছে পুরাঙ্গনাবর্গের সহর্ষ কলরবে অন্তঃপুর মুখরিত। চারিদিকে আনন্দ, উল্লাস, জীবন্তভাব; চিরশত্রুরও শত্রুতা ভুলিয়া আজ গ্রামবাসিগণ পরস্পর প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতেছে! যে নিতান্ত দরিদ্র, সে-ও গৃহাগত আত্মীয় বন্ধুকে 'মিষ্টমুখ না করিয়া' যাইতে দিতেছে না; একখানি ছোট ডিসে একটি লাড়ু বা একখানা জিলিপি ও এক গ্লাস জল দিয়াও তাহার অভ্যর্থনায় রত। বর্ষীয়সী বৃদ্ধরা প্রণতা যুবতীগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন, "জন্মএয়োস্ত্রী হও; পাকা চুলে সিদুর পর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক;"- আশীর্বাদভাজন পল্লী যুবকগণকে বলিতেছে, "সোনার দোয়াত কলম হোক, ধনেপুত্রে লক্ষেশ্বর হও; আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক!"

বিজয়াদশমীর রাত্রে বঙ্গ আনন্দ-মগ্ন!

কিন্তু এমন আনন্দের দিনেও কি সুখ সর্বব্যাপী হইতে পারিয়াছে? যাহারা সংবৎসরের মধ্যে সংসারের অবলম্বন প্রিয়তম স্বজনকে হারাইয়াছে, আজিকার এই হর্ষোৎসবে তাহাদের শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই উৎসবময়ী রাত্রে শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ তাহাদের হৃদয়ের সুগভীর বিষাদান্ধকার অপসারিত করিতে পারিতেছে না!

পূজা-বাড়িতে বাদ্যধ্বনি থামিয়া গিয়াছে। এই কয় দিন যে বেদীর উপর দুর্গাপ্রতিমা অলৌকিক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন- আজ চণ্ডীমণ্ডপে সেই বেদী শূন্য পড়িয়া আছে; নিকটে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহাতে গৃহের অন্ধকার দূর হইতেছে না! যেন আনন্দময়ী কন্যাকে দীর্ঘকালের জন্য বিদায়দানের পর পিতৃগৃহের সুগভীর নিরানন্দভাব ও মাতৃহৃদয়ের সুতীব্র বিরহ বেদনা উৎসবনিবৃত্ত কর্মশ্রান্ত অবসাদ-শিথিল ক্ষোভ বিহ্বল বঙ্গগৃহের সেই ম্লান দীপালোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

দীনেন্দ্রকুমার রায় ঃ পল্লী চিত্র, কলকাতা, ১৩৯০

নির্ঘণ্ট

অধ্যাপক দানী ৫৮
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৮১
অষ্টগ্রাম ৫৩
অষ্টগ্রামের মুহররম ৫২
অষ্টনাগের পূজা ১৯

আহিনুল ইসলাম খন্দকার ৩৫
আকবর ৯৪, ৯৬
আকরম খাঁ ৩৭
আজমীর ৩৪
আজাদ হোসেন বিলগ্রামী ২২
আজিমপুর ৫৯, ৬২
আবদুর রহিম ২১, ২২, ৩১
আবদুস সাত্তার ৪২
আবু তালিব ২১, ২৭
আবুল ফজল ৪০
আবুল বাসেত ২৬
আবুল মনসুর আহমদ ১৯, ২০, ২৪, ২৭
আবু যোহা নূর আহমেদ ২৯
আরমোনিয়া ৪৮
আলম মুসাওয়ার ২৮, ৫৮
আলাই মিয়া ৫২
আশরাফ-উজ-জামান ২৪, ৪২
আয়াতুল্লাহ খোমেনী ৪৭
আহসান মঞ্জিল ২৮

ইবনে মাজুদ্দিন আহমদ ৩৩
ইব্রাহিম ২৯
ইমাম হোসেন ৪৭
ইরাক ৪৭, ৪৮
ইরান ৪৮, ৬৩, ৯৩
ইসমাইল ২৯
ইসলাম খাঁ ২১, ৫৫, ৬৯
ইসলামপুর ৭০, ৭১, ৭২, ৭৪
ইহতিমাস খান ৩০

ঈদ-উল-আজহা ১৫, ১৬, ২২, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪২,
ঈদ-উল-ফিতর ১৫, ১৬, ২৯, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৪

এনামুল হক ৯৪, ৯৫, ৯৬
এশিয়াটিক সোসাইটি ২৮

ওয়াকিল আহমদ ৩৫
ওয়াইজ ১৮
ওহাজুদ্দীন আহমদ ৩৫

কমলাপুর ২৪
কলকাতা ১৭, ৩৬
কংসনারায়ণ ৮৩
কাজী কাদের নওয়াজ ৪০
কামরুদ্দীন আহমদ ২৬, ৬১, ৭৭, ৭৮
কামরুদ্দৌলা ৫৬

কায়রো ৪৮
কায়েতটুলী ৫৮
কিশোরগঞ্জ ৫২
কৃষ্ণ কুমার দত্ত ৩২
কৃষ্ণ কুমার মিত্র ১৯
কৃষ্ণদাস বসাক ৬৯
ক্রিসমাস ১৭

খন্দকার আবু তালিব ২০, ২৬
খাজা আলিমুল্লাহ্ ৫
খান মোহাম্মদ আজম ৬০
খুজিস্তান ৪৮

গনাধর ৭০
গোপালচন্দ্র মজুমদার ৩৪
গৌরীপুর ৮৫
গ্রনবউমের মতে ৪৮

চক ৫৯
চকবাজার ২৪, ২৮
চট্টগ্রাম ৪১
চাটগা ৯৬, ৯৭
চীন ১৫

জগদীশচন্দ্র সেন ৩৪
জন্মাষ্টমী ২৮
জাফরাবাদ ২৩
জাহাঙ্গীর ২১, ৩১
জাহানারা ইমাম ৩৮, ৪০
জেমস ওয়াইজ ৫০
জেসারত খান ৫৫

টাঙ্গাইল ৩৫, ৬২
টেলর ৫৫

ঢাকা ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৪৯, ৫০, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭২, ৭৯, ৯৭
ঢাকা-কিল্লা ২২, ৭৯, ৯৭
ঢাকা-প্রকাশ ৩৫, ৩৬
ঢাকায় সিলেটে ২৩
ঢাকেশ্বরী মন্দির ৫৫, ৮৮

তায়েশ ২৩
তাহিরপুর ৩৩
তুরস্ক ৩৪
তেত ৯৩
ত্রিপুরা ২২

দলিল উদ্দীন ঠাকুর ২৫
দয়ানন্দ সরস্বতী ৩৩
দিল্লী ৩৪
দীন মোহাম্মদ ৩৫
দুর্গাপুর ১৪
দেবেন্দ্র কলেজ ৫৪
দেবেন্দ্র দাস ৮৭
দ্বিতীয় মুর্শীদকুলি খাঁ ২২

ধনমন্তি ২৩
নওরোজ ৯৩, ৯৪
নওয়াজিশ মুহম্মদ খান ২২
নবাবপুর ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৯

নাজমৌদ্দৌলা ৫৬
নাথান ২১, ৩১
নুরজাহান ৯৪
নূরুদ্দীন মুহাম্মদ ৩১
নেত্রকোণা ৮৭

পরিতোষ সেন ৭৫, ৭৯
পাকিস্তান ১৮
পান্টিটোলা ৭০
পুরানা পল্টন লাইন ৬২

ফারায়েজী আন্দোলন ১৯, ৩১, ৩২, ৪১
ফরাশগঞ্জ ৫৫, ৬২
ফরিদপুর ২৪, ২৫
ফাতিমীয়া ৪৮

বাকশী বাজার ৬২
বড় কাটরা ২৮
বরিশাল ২৬
বলাইচাঁদ বসাক ৭০
বংশাল ৬৯
বাসন্তী ৮১
বাহারউদ্দীন ১৫, ১৬, ৪৭
বাহারিস্তান-ই-গায়বী ১৮
বাংলা একাডেমী ৫২, ৬১
বিডন ৭১
বিপিনচন্দ্র পাল ৫০, ৫১
বৃন্দাবন দেওয়ান ৭১
ব্যাংকক ৪২

ভবতোষ দত্ত ৬১ ৭৪, ৮৬
ভুবন মোহন বসাক ৬৯

মক্কা ১৫, ৩৪, ৯৩
মদিনা ১৬, ৯৩, ৯৪
মনোদা দেবী ৭৩
ময়মনসিংহ ১৯, ৩৩, ৮৫
মাদ্রাজ ৩৩
মানিকগঞ্জ ৫২, ৫৪, ৬২
মির হাজ-উস-সিরাজ ২১
মির্জা নাথান ২১, ৩০
মীর মশাররফ হোসেন ৩৪, ৩৫, ৫০
মীর মুরাদ ৫৫
মীর মোহাম্মদ জামান ২২
মীর সৈয়দ আলী ২২
মুকুন্দরামের চন্ডীকাব্য ২০
মুর্তজা আলী ২৫
মুহম্মদ ১৫, ৪৭
মুন্সীগঞ্জ ৯৭
মুক্তাগাছা ৮৫
মুর্শিদাবাদ ৪৯
মুহররম ১৮, ৭৮, ৯৩
মোসোপটেমিয়া ৪৮
মোহাম্মদ রেযাজুদ্দীন আল-মাশহাদী ৩৫
মৈথলি ৮৬
মৌলবী নঈমুদ্দীন ৩৪, ৩৫

যতীন সরকার ৮৭
যতীন্দ্র মোহন ৬৯, ৭০, ৭৩
যোগেশচন্দ্র বাগল ৮২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৫

রমজান ১৫, ২১, ২৮
রমাপ্রসাদ চন্দ ৮২, ৮৯
রমেশ শাস্ত্রী ৮৩
রাজশাহী ৩৩, ৯৭
রাশ হাসানা ৯৩
রেজা খাঁ ৪৯

লক্ষ্যা নদী ১৮
লালদীঘি ৪১
লেবানন ৪৮, ৬৩
ল্যাসির ৪৮

শঙ্খচন্দ্র দে ৮৪, ৮৯
শশিশেখর রায় ৩৩
শাজাত খাঁ ৩০
শাহজাহান ৪৯
শাহ সুজা ২৩, ৪৯
শামসুদ্দৌলা ৫৬
শামসুর রাহমান ৬০
সাত গম্বুজ মসজিদ ২৩
সিলাপুর ৪২
সিরাজ-উদ- দৌলা ৪৯
সিরিয়া ৪৮, ৬৩
সিসিল বিডন ৭১
সিলেট ৩০, ৫০, ৫২, ৮৯
সূত্রাপুর ৮৬
সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবতাবায়ীর ২২
সৈয়দ মুর্তজা আলী ২৫, ৫২
সৈয়দ মুস্তফা আলী ২৫
সৈয়দ আবদুল করিম ৫২

হবিগঞ্জ ৩০
হায়দারাবাদ ৩৪
হাকিম আহসান ৫৮, ৬১
হাকিম হাবিবুর রহমান ২৭, ২৮
হংকং ৪২
হুসেনী দালান ২৮, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬১
হুগলী ৪৯
হৃদয়নাথ মজুমদার ৮৪